মে ২০১৮ ❑ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৪২৫

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

রাজরানি

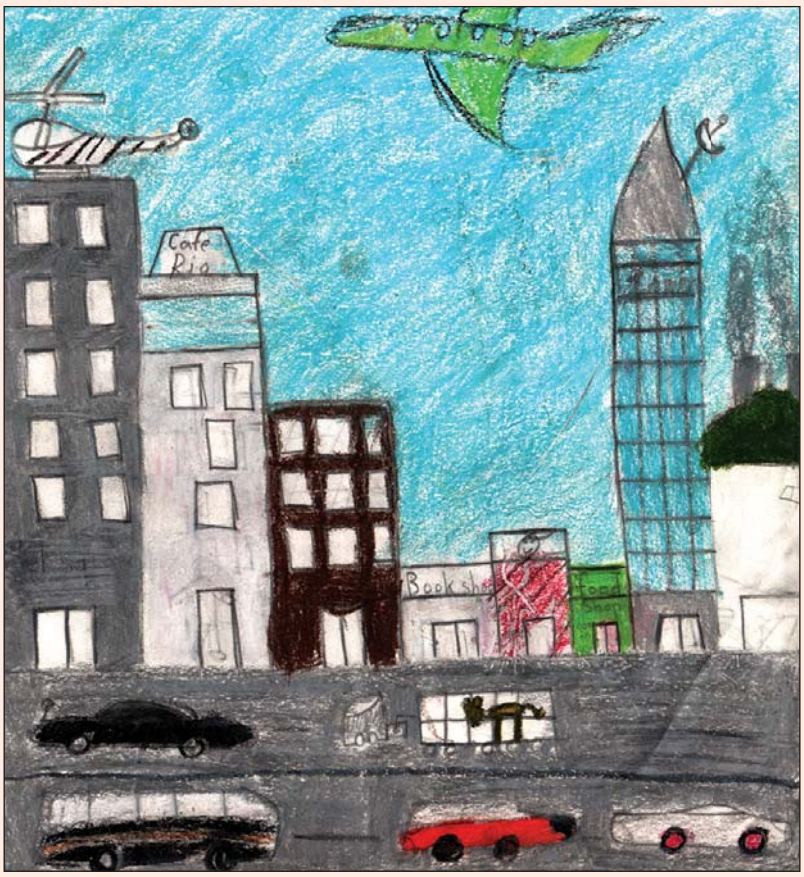

মুযাক্কির আহমেদ কাদির, দ্বিতীয় শ্রেণি, স্কলার্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা

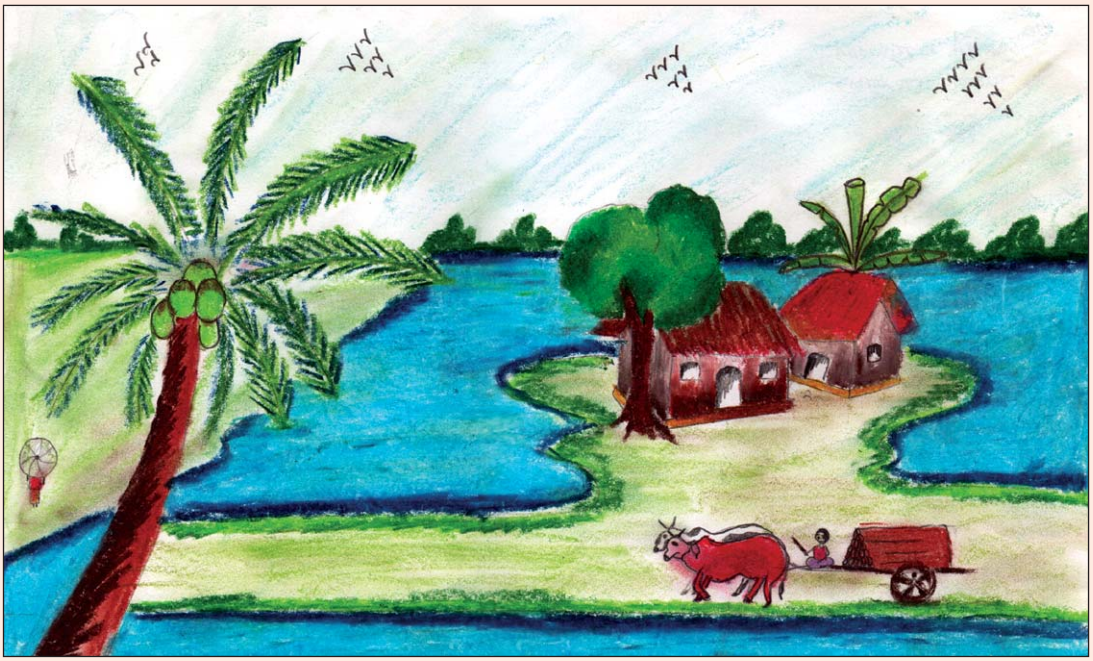

দিল আফরোজ জাহান দিয়া, ষষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

কাজী রিফাহ তাসফিয়া, চতুর্থ শ্রেণি, পল্লবী মাজেদুল ইসলাম মডেল হাই স্কুল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

এক যে ছিল দেশ। সে দেশের নাম বাংলাদেশ। সে দেশের রাজা বঙ্গবন্ধু নিহত হয়েছিলেন রাক্ষসের হাতে। তারপর সে দেশে আর কোনো হাসি ছিল না, ছিল না আনন্দ। একদিন রাক্ষসের সব আঘাত ঠেকিয়ে সে দেশে ফিরে এলেন সেই রাজার মেয়ে। নাম তাঁর শেখ হাসিনা। সেই দেশ পরম মমতায় বরণ করে নিল তাঁকে। এরপর? রাজা পেয়ে গেল সেই দেশ, নাম যার বাংলাদেশ।

রাজা-রানির গল্প শুনে বড়ো হই আমরা। আর তাই নবারুণ এবার মেতে উঠেছে 'রাজা-রানি' নিয়ে। তোমাদের কেমন লাগল, জানাবে কিন্তু।

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন

সিনিয়র সম্পাদক
মোঃ এনামুল কবীর

সম্পাদক
নাসরীন জাহান লিপি

সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ
ক্ষিরোদ চন্দ্র বর্ম্মন

সম্পাদকীয় সহযোগী
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
মেজবাউল হক
সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মূল্য : ২০.০০ টাকা

সূচি

নিবন্ধ

৯ মাকে মনে পড়ে/ আমিরুল হক
১২ রাজা-রানির গল্প শোনো / কাজী নুসরাত সুলতানা
১৮ ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ / তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
২০ দেশ-বিদেশের রূপকথায় রাজা-রানি
মো. সিরাজুল ইসলাম
২৪ বাংলাদেশে রাজার শাসন / শাহানা আফরোজ
২৬ রাজার চিঠি
৩২ বিচিত্র রাজা-রানি/ মেজবাউল হক
৩৪ রাজপ্রাসাদের কথা/ ফারিন আহমেদ
৩৫ খুদে রাজারা/সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
৫২ বিজ্ঞান : সমুদ্রের প্রাণী ডুগং/অনিক শুভ
৫৩ বুদ্ধির খেলা/ আনোয়ারা বেগম
৫৫ আজকে 'দিয়া'র একক বক্তৃতা/সালেহ আহমাদ
৬০ অপরূপ লোভাছড়া/ রুমান হাফিজ

গল্প

২৭ আমরা সবাই রাজা/বিন্দু সাহা
৩০ কে হবে রাজা/নাসিম সুলতানা
৩৯ শেষ কথা/ মাকিদ হায়দার
৪৪ ধারাবাহিক গল্প: মুক্তিযুদ্ধের দিনরাত্রি
আবুল কালাম আজাদ
৫১ বোকা শিয়ালের কাণ্ড/ইউনুস আহমেদ

কবিতা

০৫ তাবাসসুম হাবীব জান্নাহ/ মেশকাউল জান্নাত বীথি
০৮ কাজী নজরুল ইসলাম
১০ রহীম শাহ/ সোহরাব পাশা/ মিনহাজ ফয়সল
১১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৮ নুরুল হক
২৯ মুহম্মদ আহনাফ সিদ্দিক/ মো. মুশফিক মিদুল
৩১ মো. সিয়াম হোসেন/ রিপা তাসফিয়া নিশি
৩৬ গিয়াস উদ্দিন রূপম/ শাহীন আলম/ ফখরুল ইসলাম
মাহিম আসাদ
৩৭ ইলা ইয়াসমিন/ রকিবুল ইসলাম/ বাহারুল হক লিটন
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী
৩৮ মুস্তফা হাবীব/ আরিফা আক্তার/ মোহাম্মদ নূর আলম গন্ধী

প্রতিবেদন

৬১ বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমেছে/ জান্নাতে রোজী
৬২ বিশেষ শিশু নিরাপত্তা/ মো. জামাল উদ্দিন
৬৫ শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ/সুলতানা বেগম

ছোটোদের লেখা

৪৯ বাংলাদেশ কীভাবে স্বাধীন হলো/ রাবিতা তাহসীন সারাহ
৫০ ৭ই মার্চের ভাষণ/ইনফিদার আহমেদ বাঁধন

আঁকা ছবি

২য় কভার: মুযাক্কির আহমেদ কাদির
দিল আফরোজ জাহান দিয়া
০১ কাজী রিফাহ তাসফিয়া
০৩ আনুশেহ প্রতিভা
০৫ শুভ সরকার
০৯ সুইটি সাপুত্রি রহমান
১৬ অর্পিতা রায় বর্মন
২৯ মীর সাব্বির
৩৮ সাদিয়া হোসেন মিম
৪৩ মুর্শিদা আক্তার মীম
৪৪ জায়মা জারিন
৪৮ সাকিব
৪৯ নাবিলা খাতুন
৬৩ মো. শাহিদী হাসিব/ হাজেরা আক্তার (ঈশিতা)
৬৪ অতনু দাস/ আদিল হক

শিল্প নির্দেশক
সঞ্জীব কুমার সরকার

সহযোগী শিল্প নির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৪২, ৯৩৩১১৮৫
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০

মুদ্রণ : মিতু প্রিন্টিং প্রেস এন্ড প্যাকেজিং
১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

দেশরত্নের নতুন আভায়

বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর দীর্ঘ ছয় বছর নির্বাসন শেষে গণতন্ত্রের মানসকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের ১৭ই মে ফিরে আসেন বাংলার মাটি ও মানুষের কাছে। তাঁর এই ফিরে আসা নিয়ে শাফিকুর রাহীর কবিতা পড়ো পৃষ্ঠা **০৪**

ঠোঙা ইশকুলে যায়

নাম তার টুম্পা। কাগজের ঠোঙা কুড়ায় বলে সবাই তাকে ঠোঙা বলে ডাকে। সকালে ঠোঙা কুড়িয়ে বিকালে স্কুলে যায় সে। ছোট্ট ঠোঙাকে নিয়ে আবেদীন জনীর মে দিবসের বিশেষ গল্প পড়ো পৃষ্ঠা– **০৬**

আনুশেহ প্রতিভা, দ্বিতীয় শ্রেণি, উদয়ন উচ্চ বিদ্যালয়, আজিমপুর, ঢাকা।

নবারুণ-এর ফেসবুক পাতায়

দিলরুবা পুষ্প : আসসালামু আলাইকুম। আমি নবারুণে এপ্রিল সংখ্যায় লেখা দিয়েছিলাম; এখন আমি কি কোনো কপি পাব না?

শিক্ষার্থী, গফরগাঁও সরকারি কলেজ, নান্দাইল, ময়মনসিংহ।

লেখা ছাপা হলে অবশ্যই তোমার দেওয়া ঠিকানায় পৌঁছে যাবে পত্রিকা।

তোফাজ্জল হোসেইন মাহিন: আমি কীভাবে নবারুণ এর গ্রাহক হতে পারি?

চন্ডীপাশা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, নান্দাইল, ময়মনসিংহ

নবারুণ পত্রিকাটি সারা দেশে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য অফিসগুলোর মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। এর বাইরেও পত্রিকার গ্রাহক/এজেন্ট ৩৩% কমিশনে পত্রিকা পাচ্ছেন। আপনার এলাকায় এজেন্ট আছে কি না, তা জেনে নিতে পারেন চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের বিতরণ শাখায়। আর লেখা ছাপা হলে প্রকাশিত লেখার লেখকের প্রদত্ত ঠিকানায় পত্রিকা পাঠানোর ব্যবস্থা আছে। নবারুণ-এর চাঁদা বার্ষিক ২৪০.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ১২০.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২০.০০ টাকা। বছরের যে-কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যাবে। মানি অর্ডার বা নগদ চাঁদা পাওয়ার সাথে সাথে পরবর্তী সংখ্যা থেকে নির্ধারিত সময়সীমা পর্যন্ত ডাকযোগে পত্রিকা পাঠানো হয়। এ ব্যাপারে বিস্তারিত যোগাযোগের জন্য ঠিকানা : সহকারী পরিচালক / উপ-পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা -১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০। (সেল : জনাব আব্দুল্লাহ শিবলি সাদিক, সহকারী পরিচালক-০১৯২১৯৮৪০৯০)

হিজল তমাল: লেখা পাঠাতে চাই। কীভাবে পাঠাবো?

SutonnyMJ Font- এ ই- মেইলে লেখা পাঠানোর অনুরোধ রইল সব লেখকদের প্রতি।
ই-মেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

দেশরত্নের নতুন আভায়

শাফিকুর রাহী

কান্নাহাসি শোকে দুঃখে বারো মাসে
দীর্ঘজীবন কাটল যে তাঁর দীর্ঘশ্বাসে।
নানা শঙ্কায় দুর্ভাবনায় স্বাধীন জাতি,
বড়ো কষ্টে দিনাতিপাত আঁধার রাতি।
এ অবক্ষয় পতন থেকে উত্তরণে
কোন্ সে মহান নেতা তিনি সারাক্ষণে
ভাবেন বসে পিতার স্বপ্ন সফল করতে
দুঃসাহসী মনোবলে যুদ্ধে লড়তে
ডর ভয়কে পেছন ফেলে যায় এগিয়ে
দিন বদলের দেন প্রেরণা সকলকে নিয়ে।
বাংলাদেশের সুবর্ণজয়ন্তী কালে,
লাগল দোলা বঙ্গবন্ধুর নায়ের পালে।

গরিব দুঃখীর মলিন মুখে ফুলেল হাসি,
সফলতায় বিস্মিত আজ বিশ্ববাসী।
সৌহার্দ্য সম্প্রীতির সুরে বাজল বাঁশি,
শহর-নগর-গঞ্জ-গাঁয়ে পিসি মাসি
খুশির হাওয়ায় জিকির করেন মহানন্দে
আঁধার কেটে আলোর নাচন দারুণ ছন্দে।

দেশরত্নের মহান দর্শন ডিজিটালে
সকল বাধার ভাঙে আঁধার সমকালে।
তাঁর মমতায় স্বদেশবাসী জাগল আবার
তিনি এখন বিশ্বগর্ব মানবতার।
তাঁর বীরত্বের অসামান্য অবদানে
কালজয়ী ছড়িয়ে আভা সকল খানে।

আকাশ দাওয়ায় বইছে হাওয়া খুশির বানে,
মহান ত্যাগের বিরল হাসি সবার প্রাণে।
আলোকিত আগামীরই সম্ভাবনায়
বিশ্বজয়ী দেশরত্নের নতুন আভায়,
জগৎ জয়ের বাজনা বাজে হাটে-মাঠে,
খোকা খুকু মানুষ হবে–মগ্ন পাঠে।

মানুষ হবার দীক্ষা

তাবাসসুম হাবীব জান্নাহ

শ্রমিক কেন মরবে খেটে কাজ করে
নিয়তিকে পরের হাতে ভাঁজ করে?
শ্রমিক বলে ওদের কোনো হেলা নয়
শ্রমের মূল্য নিয়ে আবার খেলা নয়।

দানবতা সমাজ-দেশে অচল হোক
মানবতা সব জাগাতে সচল হোক
সমাজপতির কাছে কঠিন ভিক্ষা চাই
মে দিবসে মানুষ হবার শিক্ষা চাই।

সপ্তম শ্রেণি, সাউথ ওয়েস্ট সালেহ আহমদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, জাউয়া বাজার, ছাতক, সুনামগঞ্জ।

শিশু

মেশকাউল জান্নাত বীথি

আমার মতো সব শিশু
যাবে তারা স্কুলে
সব বাধা পেরিয়ে
থাকব ভালো সবাই মিলে।

সবাই মিলে এসো তাদের
করি সহযোগিতা
ভালো থাকবে তারা
জীবন হবে আনন্দে গাথা।

অষ্টম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, খিলগাঁও, ঢাকা।

শুভ সরকার, ষষ্ঠ শ্রেণি এস.এম. মডেল সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, গোপালগঞ্জ

মে দিবসের গল্প

ঠোঙা ইশকুলে যায়

আবেদীন জনী

মিষ্টি মেয়ে মিথিলা। চপলা চঞ্চলা ওর মনটা। দৌড়ে ছোটে ধুলো উড়িয়ে। হাওয়ায় মেঘলা কালো চুল এলিয়ে। কখনো কখনো সবুজ ঘাসের মাঠে গড়াগড়ি খায়। ফড়িং-এর মতো খেলতে থাকে লাফিং ঝাপিং। পাখির সঙ্গে কথা বলে। ফুলের সঙ্গে হাসাহাসি করে। আর পাতার বাঁশি বাজিয়ে বেড়ায় পোঁ-পোঁ।

মিথিলার সবকিছু করতে ভালো লাগে। শুধু ইশকুলে যেতে ভালো লাগে না। লেখাপড়া, শাসন-বারণ, কেমন যেন তিতকুটে লাগে ওর।

একদিন মা মিথিলাকে বললেন, শুনেছ কি মিথিলা, ঠোঙা ইশকুলে যায়। কিন্তু তুমি যেতে চাও না কেন? মায়ের কথা শুনে মিথিলা ফিক করে হেসে ফেলল।

মা একটু রেগে বললেন, তুমি হাসলে কেন? আমি কি হাসির কথা বলেছি?

মিথিলা হাসি থামিয়ে বলল, ঠোঙার তো হাত-পা নেই। প্রাণ নেই। কাগজের ঠোঙা আবার ইশকুলে যায় কীভাবে?

মা বললেন, বোকা মেয়ে! ইশকুল ফাঁকি দিয়ে জ্ঞানবুদ্ধির মাথা খেয়েছ। বলছি কী- এটা কাগজের ঠোঙা না। তোমার মতো ছোট্ট তুলতুলে এক খুকির নাম ঠোঙা।

মিথিলা আবারো হেসে হেসে প্রশ্ন করল, মানুষের নাম ঠোঙা হয় নাকি?

মা বললেন হ্যাঁ, হতে পারে। কত রকমের নাম হয় মানুষের। তবে ঠোঙা ওর আসল নাম না। আসল নাম হচ্ছে টুম্পা।

টুম্পা নামটা কী সুন্দর! বলো না মা, এই সুন্দর নামটা বাদ দিয়ে খুকিটির নাম ঠোঙা হলো কেন? আমার কাছে খুব অদ্ভুত লাগছে।

নামটা একটু অন্যরকম। তা হোক। নামই মানুষের আসল পরিচয় নয়। আসল পরিচয় হচ্ছে আচরণে। জ্ঞানে আর গুণে। ওর মা-বাবা তো ওর নাম টুম্পাই রেখেছিলেন। এখন ওর মা নেই। বাবা নেই। ঘর নেই। বাড়ি নেই। পথে পথে ঘুরে বেড়ায় আর কাগজের ঠোঙা কুড়ায়। আরো কুড়ায় পানির খালি বোতল, প্লাস্টিক আর লোহার টুকরো। এগুলো বেচেই খায় দায়। ঘুম এলে ঘুমায় পথের পাশে। ফুটপাতে। কাগজের ঠোঙা কুড়ায় বলেই মানুষ ওকে ঠোঙা বলে ডাকে।

মিথিলা বলল, কিন্তু মা, তুমি যে বললে, ঠোঙা নাকি ইশকুলে যায়।

-হ্যাঁ, যায় তো। সকালে কিছুক্ষণ ঠোঙা কুড়ানোর পর ইশকুলের বেলা হলে ইশকুলে যায়। ছুটি হলে আবার ঠোঙা কুড়ানো শুরু করে।

সব সময় ওর সঙ্গে থাকে দুটি ব্যাগ। একটিতে ঠোঙা কুড়িয়ে জমা করে। অন্য ব্যাগটিতে বই-খাতা-কলম, কাঠ পেন্সিল, রং পেন্সিল। কখনো বা পথের মোড়ে একটু নিরিবিলি জায়গা পেলে ধপ করে বসে। তারপর ব্যাগ থেকে বই-খাতা-কলম বের করে মন দেয় লেখাপড়ায়। শিক্ষিত গোছের লোক দেখলে ডেকে বলে, এই যে আংকেল। কখনো বলে, এই আপু-বানানটা বলে দিয়ে যাও না। আর এই অঙ্কটা। নামতা পড়াটাও ভুলে গেছি গো।

বেশিরভাগ লোকই ঠোঙার ডাক শুনে খুশিমনেই এগিয়ে আসে। লেখাপড়ার প্রতি ওর আগ্রহ দেখে অবাক হয়। একটু দাঁড়িয়ে পড়া বলে দিয়ে যায়।

কখনো দু-একজনে বলে, ভাত জোটে না, আবার লেখাপড়া! তারপর চলে যায় হনহন করে। এতে ঠোঙার মন একটুও খারাপ হয় না। হবে কেন? সবাই কি আর লেখাপড়ার মর্ম বোঝে?

ঠোঙা তার থেকে বড়ো ছাত্রছাত্রীদের ইশকুল বা কলেজে যেতে দেখলে জিজ্ঞেস করে, এই, তোমরা বুঝি খুব বড়ো ক্লাসে পড়ো, না? আমি এখন ছোটো ক্লাসে পড়ি। বড়ো হলে আমি বড়ো ক্লাসে পড়ব। এখন আমার মাত্র কয়েকটা

ছোট্ট ছোট্ট বই-খাতা। তখন আমার অনেকগুলো মোটা মোটা বই থাকবে। খাতা থাকবে।

মা বললেন, শোনো মিথিলা, ঠোঙার এত কষ্ট, তবুও ইশকুলে যাচ্ছে। কেননা, ঠোঙা অনেক বড়ো হতে চায়। তুমি যে ইশকুলে যাচ্ছ না, তাহলে বড়ো হবে কেমন করে?

মিথিলা বলল, ইশকুলে না গেলে কি বড়ো হওয়া যায় না মা? গাছ ইশকুলে যায় না, মাছও ইশকুলে যায় না আর মন্টুদের বলদ গরুটাও মস্ত বড়ো। ওটাও ইশকুলে যায়নি। তাহলে ওরা বড়ো হয় কীভাবে?

- গাছ, মাছ, গরু-এগুলোর ইশকুলে যেতে হয় না। কিন্তু মানুষদের বড়ো হতে হলে ইশকুলে গিয়ে লেখাপড়া করতে হয়। লেখাপড়া ছাড়া শুধু হাত-পা-শরীর বড়ো হয়। বুদ্ধি বড়ো হয় না। এবার বুঝলে তো মিথিলা?

মিথিলা মাথা ঝাঁকিয়ে জানিয়ে দিল, হ্যাঁ মা, বুঝছি। আমি কাল থেকেই ইশকুলে যাব। কিন্তু মা, আমি একা একা ইশকুলে যাব না। প্রতিদিন ঠোঙার সঙ্গে যেতে চাই। আরো বলল, আমার তো মা-বাবা আছে। ঠোঙার নেই কেন? আমাদের বাড়ি আছে। গাড়ি আছে। ঠোঙাদের থাকবে না কেন? ওর কত কষ্ট! আচ্ছা মা, ওকে আমাদের বাড়িতে নিয়ে আসা যায় না?

মা মিথিলার কথা শুনে অবাক হলেন। রাজি হলেন ঠোঙাকে বাড়ি নিয়ে আসতে। তারপর খুঁজতে শুরু করলেন। খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ এক পথের মোড়ে পেয়েও গেলেন ঠোঙাকে। বললেন, তোমাকে আর কাগজের ঠোঙা কুড়াতে হবে না। তোমাকে খেতে দেবো। জামা দেবো। জুতো দেবো। দেবো লাল টুকটুকে চুলের ফিতা। বই-খাতা-কলমও দেবো। রং পেন্সিল দেবো। খেলবে, পড়বে, ছবি আঁকবে আর প্রতিদিন ইশকুলে যাবে আমাদের মিথিলার সঙ্গে। তুমি কি যাবে আমাদের বাড়ি?

ঠোঙা কিছুক্ষণ চুপ থাকল। তারপর মিষ্টি হেসে মাথা কাত করে বলল, যাব।

মা ঠোঙাকে বাড়ি নিয়ে এলেন। মিথিলা ঠোঙাকে পেয়ে আর ঠোঙা মিথিলাকে পেয়ে দারুণ খুশি। ওরা এখন একসঙ্গে খায়। একসঙ্গে ইশকুলে যায়। একসঙ্গেই খেলাধুলা করে। ওরা যেন আপন দুই বোন। একসঙ্গে উড়ে বেড়ানো, ঘুরে বেড়ানো এক জোড়া রঙিন প্রজাপতি।

মানুষ

কাজী নজরুল ইসলাম

জন্ম : ২৪শে মে ১৮৯৯ (১১ জ্যৈষ্ঠ্য ১৩০৬ বঙ্গাব্দ)
মৃত্যু : ২৯শে আগস্ট ১৯৭৬ (১২ ভাদ্র ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ)

গাহি সাম্যের গান-
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
'পূজারী, দুয়ার খোলো,
ক্ষুধার ঠাকুর দাঁড়ায়ে দুয়ারে পূজার সময় হ'ল!'
স্বপন দেখিয়া আকুল পূজারী খুলিল ভজনালয়,
দেবতার বরে আজ রাজা-টাজা আজ হয়ে যাবে নিশ্চয়!
জীর্ণ-বস্ত্র শীর্ণ-গাত্র, ক্ষুধায় কণ্ঠ ক্ষীণ
ডাকিল পান্থ, 'দ্বার খোল বাবা, খাইনি ক' সাত দিন।
সহসা বন্ধ হ'ল মন্দির, ভুখারী ফিরিয়া চলে,
তিমির রাত্রি, পথ জুরে তার ক্ষুধার মানিক জ্বলে! ...

[সংক্ষিপ্ত]

মাকে মনে পড়ে

আমিরুল হক

ছোট্ট একটি শব্দ 'মা'। অতুলনীয় এই মা শব্দটির উচ্চারণে মনের সব দুঃখকষ্ট ব্যথা ঘুচে গিয়ে হৃদয়ের মাঝে যেন বয়ে আনে পরম শান্তি। 'মা' শব্দটির মতো এত সুমধুর শব্দ পৃথিবীতে আর একটিও আছে কিনা জানি না। শ্রুতিমধুর 'মা' ডাকের মধ্যে আছে প্রগাঢ় সুখ আর প্রচণ্ড ভালোবাসা। মায়ের জন্যই পৃথিবীতে এসেছি। জন্মের পর মাকে মা বলে ডেকেছি। মায়ের অকৃত্রিম স্নেহ-মায়া-মমতা মাখা আদরে হাঁটি হাঁটি পা পা করে বড়ো হয়েছি। আমাকে মানুষ করার জন্য খেয়ে না খেয়ে রাতের ঘুম হারাম করে দিনের পর দিন কত কষ্ট, ত্যাগই না করেছেন। তবুও মায়ের চোখে-মুখে ছিল না কোনো ক্লান্তি। দেখিনি কখনো বিরক্তের ছাপ। মায়ের হাসি মাখা মুখ আজও আমার প্রাণ ছুঁয়ে যায়।

কি অসাধারণ ধৈর্যশীলা 'মা'। সংসারের প্রতিটি কাজ তিনি নিজ হাতে করতেন। আমার মায়ের কাছে শিখেছি আচার-আচরণ ব্যবহার। কেমন করে বড়োদের সম্মান করতে হয়, কথা বলতে হয়, সম্পর্ক ধরে রাখতে হয় আত্মীয়স্বজন, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মিলেমিশে থাকতে হয়। বলতে গেলে বলতে হয় রীতিনীতি, আদবকায়দা, আচার আচরণ শেখার প্রথম শিক্ষক মা। আমাকে নিয়ে মায়ের অনেক স্বপ্ন, অনেক আশা। আমাকে তিনি ডাক্তার বানাবেন। সেই স্বপ্নের কথা সব সময়ই বলতেন আর উৎসাহ দিতেন। আমি কখনো পড়ালেখা ফাঁকি দেইনি। পড়ালেখায় খুব ভালো ছিলাম তা বলব না, তবে খুব সিরিয়াস ছিলাম। শৈশব পেরিয়ে কৈশোর। তারপর যৌবনে পা রাখার পর জানলাম সন্তানের জন্য মায়ের উৎকণ্ঠার যেন শেষ নেই। আমার প্রতিটি কাজকর্মে মায়ের নজরদারি ছিল বলে আজ আমি এতটা পথ আসতে পেরেছি। মায়ের সেই স্বপ্ন হয়ত আমি পূরণ করতে পারিনি। তবে মায়ের প্রতিটি শিক্ষাকে বিফলে যেতে দেইনি, কাজে লাগাতে চেষ্টা করেছি। আমিও একজন ভালো বাবা হতে চেয়েছি। দুই কন্যা সন্তানের বাবা আমি। আমি যা পারিনি তা আমার সন্তানের মাঝে দেখতে চেয়েছি।

তাই এক মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রিতে শিক্ষিত করেছি। আরেক মেয়েকে ডাক্তার বানিয়ে আমার প্রয়াত মায়ের স্বপ্ন কিছুটা হলেও পূরণ করতে পেরেছি। আজ আমার মা নেই কিন্তু মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে আজও বেঁচে আছি। মায়ের ভালোবাসা, মায়ের মমতা মাখা আদরের পরশ আমি আজও অনুভব করি। আজ হয়ত মাকে জড়িয়ে ধরে আমার ভালোবাসার কথা জানাতে পারব না। কিন্তু পরম করুণাময়ের কাছে মায়ের প্রতি আমার ভালোবাসা আর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলতে পারব আমার মা যেন জান্নাতবাসী হন।

সুইটি সাপুত্রি রহমান, নবম শ্রেণি, চাইল্ড হেভেন আর্ট স্কুল, লক্ষ্মীবাজার, ঢাকা

বীরপুরুষ

রহীম শাহ

মা বলেছেন, খোকন তুমি
ঘরের কোণে থাকবে না
জগৎটাকে দেখবে যদি
মনকে বেঁধে রাখবে না।

পাহাড় সাগর বন পেরিয়ে
সকল বাধা যাও এড়িয়ে,
ছুটবে তুমি ছুটবে কেবল
পেছন দিকে ফিরবে না।

পড়ো যদি সাগর মাঝে
থাকবে যে মীনরাজের সাজে,
যতই পড়ো ঝড়ের মুখে
তীরে কভু ভিড়বে না।

হাজার পাহাড় ঠেলে ঠেলে
ছুটবে তুমি হেসে-খেলে,
মনে মনেও বলবে না যে
ছুটতে তুমি পারবে না।

সামনে আবার দত্যি এসে
ভয় দেখাতে এলে শেষে–
হাতের মুঠোয় ভরবে তাকে
ছল করলেও ছাড়বে না।

এই পৃথিবী দেখার শেষে
যেতে পারো তারার দেশে,
উঠবে যখন ওপর দিকে
নিচের দিকে নামবে না।

ভয় দেখাতে বারে বারে
সূর্য আগুন ঢালতে পারে,
ছুটবে তুমি ছুটবে কেবল
ঘামবে তবে থামবে না।

গ্রহে গ্রহে ঘুরে ঘুরে
হাজার তারার মুঠোয় পুরে–
নেবে যখন, তোমার পাশে
ঠিকই ছুটে আসবে মা;

উজল আলোয় চোখটা রেখে
চমকাবে এক দৃশ্য দেখে,
বিশ্বটাকে জয় করা এই
বীরকে দেখে হাসবে মা।

মা

সোহরাব পাশা

মা হাসলেই অন্ধকারে ঝরে পড়ে জ্যোৎস্নার বকুল
ঢেউ জাগে মৃতপ্রায় নদীর গ্রীবায়
পাথরে গড়িয়ে পড়ে ঝরনা অনন্ত অমিয়ধারা
চোখের আলোয় ওড়ে নীল প্রজাপতি
মুখর বসন্ত ফোটে প্রাণের গহিনে
খুলে যায় দ্বার সকল বাঁধন রঙিন উৎসবে
শব্দশূন্য ঝরে পড়ে পুঞ্জিভূত নির্জন বেদনা
সব দাগ উঠে যায় বিষাদ-ক্লান্তির;

পৃথিবীতে কিছু শব্দের বিকল্প কোনো ব্যাখ্যা নেই
সমার্থক অর্থ নেই যেমন তোমার জ্যোতির্ময় উচ্চারণ
মা
তুমি হাসলে ফুলের ভেতর ঘুমিয়ে পড়ে সব দুঃখ দিন

মা

মিনহাজ ফয়সল

কষ্ট পেলে বোঝেন মা যে
থাকি যদি দূরেও
কেমন আছি বলতে পারেন
কথা বলার সুরেও।

হাসলে আমি মায়ের মুখে
ফোটে মধুর হাসি তো
সত্যি করে বলছি মা-গো
তোমায় ভালোবাসি তো।

মায়ের সাথে বলি কথা
ভুলে যদি রেগেও
মায়ের মুখে মধুর হাসি
দেখি সকাল জেগেও।

মায়ের কাছে শুধু আছে
ভালোবাসার খনি তো
মায়ের মুখে শুনি কেবল
আমি চোখের মণি তো।

রাজা ও রানি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জন্ম : ৭ই মে ১৮৬১ (২৫শে বৈশাখ ১২৬৮ বঙ্গাব্দ)
মৃত্যু : ৭ই আগস্ট ১৯৪১ (২২শে শ্রাবণ ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ)

এক যে ছিল রাজা
সেদিন আমায় দিল সাজা।
ভোরের রাতে উঠে
আমি গিয়েছিলুম ছুটে,
দেখতে ডালিম গাছে
বনের পিরভু কেমন নাচে।
ডালে ছিলেম চড়ে,
সেটা ভেঙেই গেল পড়ে।
সেদিন হল মানা
আমার পেয়ারা পেড়ে আনা,
রথ দেখতে যাওয়া,
আমার চিঁড়ের পুলি খাওয়া।
কে দিল সেই সাজা,
জান কে ছিল সেই রাজা ?

এক যে ছিল রানী
আমি তার কথা সব মানি।
সাজার খবর পেয়ে
আমায় দেখল কেবল চেয়ে।
বললে না তো কিছু,
কেবল মুখটি করে নিচু
আপন ঘরে গিয়ে
সেদিন রইল আগল দিয়ে।
হল না তার খাওয়া,
কিংবা রথ দেখতে যাওয়া।
নিল আমায় কোলে
সাজার সময় সারা হলে।
গলা ভাঙা - ভাঙা
তার চোখ - দুখানি রাঙা।
কে ছিল সেই রানী
আমি জানি জানি জানি।

[শিশু ভোলানাথ কাব্যগ্রন্থ]

রাজা-রানির গল্প শোনো

কাজী নুসরাত সুলতানা

সে অনেককাল আগের কথা। এক দেশে ছিলেন এক রাজা। মস্ত সে দেশ, বিশাল সে রাজার রাজ্য! সে রাজ্যে ছিল ভালো মানুষের মেলা। সেই মানুষেরা তাদের রাজাকে খুব ভালোবাসতেন, কারণ তাদের রাজা তাদেরকে ভালোবাসতেন, খেয়াল রাখতেন তাদের সুখ-সুবিধার। রাজ্যের দুই পাশ দিয়ে বয়ে যেত স্বচ্ছ জলধারার শান্ত দুটি নদী। খুব ভালো ফসল ফলত সে দেশে। তাই ঘরে ঘরে উঠত রাশি রাশি ধান, প্রজারা সে ধান গোলায় ভরে রাখতেন সারা বছরের খাবারের জন্য। তাদের ছিল পুকুর ভরা মাছ, উঠান ভরা হাঁস-মুরগি, গোয়াল ভরা গরু-ছাগল আর বাগান ভরা হরেক রকম মৌসুমী ফল। ঘন সবুজ বনজঙ্গলও ছিল সেই দেশে। সেই বনে বাস করত হাজার রকম পশু আর পাখপাখালি। তাদের সবজির ক্ষেতগুলোতে, বাড়ির আনাচেকানাচে হতো নিত্য সবজির প্রচুর ফলন। সে রাজ্যের শিশুদের মাছ-ভাত, শাকসবজি আর দুধ-মধুর কোনো অভাব ছিল

না। অভাব ছিল না লেখাপড়া করার পাঠশালার আর খেলাধুলা করার মাঠের। কামার, কুমোর, তাঁতি আর স্যাকরাদেরও কাজের কোনো অভাব ছিল না। তারা তৈরি করতেন সুন্দর সুন্দর সব জিনিসপত্র। সেসব জিনিসপত্র বিক্রি হতো হাটেবাজারে। হাটবাজার জমজমাট থাকত ক্রেতা আর বিক্রেতায়।

সে দেশের রাজার ছিল টাকাপয়সা, সোনা-রূপা, আর হিরা-মানিক্যে ভরপুর বিশাল ধনভাণ্ডার; ছিল বিশ্বস্ত মন্ত্রী-আমাত্য, ছিল লাখ লাখ সৈন্যসামন্ত, হাতিশালে ছিল হাজার হাজার হাতি, ঘোড়াশালে হাজার হাজার ঘোড়া; পাইকপেয়াদা, দাসদাসীরও অন্ত ছিল না।

রাজপ্রাসাদেও ছিল সুখের বন্যা। রাজার ছিল এক রূপবতী ও গুণবতী রানি আর ছিল এক ফুটফুটে কন্যা। রাজকন্যা যেমন রূপবতী তেমনি গুণবতী। খুব হাসিখুশি মেয়ে ছিল সে। সবার সাথে ভালো ব্যবহার করত, কাউকে কোনোদিন কষ্ট দিত না। যার সাথেই দেখা হতো, হাসিমুখে শ্রদ্ধার সাথে কথা বলত। লেখাপড়া, গানবাজনা, খেলাধুলা, ছবি আঁকা কোনোকিছু শিখতেই তার আগ্রহের অভাব ছিল না; শিখতও খুব যত্ন করে। সবাই তাকে খুব পছন্দ করত, ভালোবাসত।

একদিন হলো কি . . .

এইবারে একটু থামি! গল্পের বাকি কথায় একটু পরে আসি। তার আগে বরং কিছু অন্য কথা বলি। এই রকম রাজা-রানি আর রাজকন্যার গল্প তো তোমরা অনেক শুনেছ, শুনতে বেশ ভালোও লাগে তাই না? আচ্ছা, কখনো কি মনে এ রকম প্রশ্ন জেগেছে যে রাজা হতেন কেমন করে? সবকিছুরই তো একটা শুরু আছে। তাহলে প্রথম যিনি রাজা হলেন তিনি রাজা হলেন কেমন করে? আজকাল সে রকম দেশ, সে রকম রাজা আর বিশেষ দেখা যায় না কেন? কারো কারো মনে নিশ্চয়ই এমন প্রশ্ন জেগেছে কখনো কখনো! তাহলে এ রকম কিছু ব্যাপার সম্পর্কে জেনে নেওয়ার চেষ্টা করলে কেমন হয়? মন্দ হয় না, তাই না?

কবে যে পৃথিবীতে প্রথম কেউ একজন রাজা হলেন সে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না। কারণ এখন যেমন করে ইতিহাস লেখা হয় তেমন করে পুরাকালে লেখা হতো না। তবে কিছুটা ধারণা করা যায় যেখানে যা কিছু লেখা পাওয়া গেছে সেগুলো থেকে। আসলে মানুষের ইতিহাসের আদি কালে কোনো রাজা ছিলেন না, কারণ সে সময় রাজার কোনো দরকারই ছিল না। তাহলে তো জানতে হয় কেন দরকার ছিল না। সে কথা জানার আগে অন্য একটা কথায় আসি। তোমার বিদ্যালয়ের কথা চিন্তা করো। তোমার বিদ্যালয়ে কারা কারা আছেন? অনেকে আছেন, তাই না? তোমরা, মানে ছাত্রছাত্রীরা আছো, তোমাদের শিক্ষকরা আছেন, আছেন দারোয়ান আর পিয়ন মামা-খালারা। আর আছেন প্রধান শিক্ষক মহোদয়। এই সবার মধ্যে প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের কী কাজ, তিনি একটা ঘরে বসে বসে কী করেন কখনো কি ভেবে দেখেছ? মাঝে মাঝে তোমাদের শ্রেণিকক্ষে এসে পড়ান বটে; কিন্তু বেশিরভাগ সময় তো ওই ঘরেই বসে থাকেন, তাই না? তোমরা নিশ্চয়ই বলবে, 'শুধু শুধু তো বসে থাকেন না। সারা বিদ্যালয়ের কোথায় কি হচ্ছে তার খোঁজখবর রাখা, কোথায় কী হবে না হবে বা কখন কী করতে হবে না বা হবে তার দিক নির্দেশনা দেওয়া, এসব তো তিনি ওখানে বসেই করে থাকেন। সে তো মস্ত কঠিন কাজ!'। তা তো বটেই।

কিন্তু আমি রাজার কথা বলতে বলতে তোমার বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের কথাটা তুললাম কেন? নিশ্চয়ই এ রকম একটা প্রশ্ন আসছে তোমার মনে! আসলে কি জানো তোমার প্রধান শিক্ষক তোমার বিদ্যালয়ের জন্য যে কঠিন কাজটা করেন তেমনি ধরনের কঠিন কাজ করতে হতো কোনো বিশাল রাজ্যের রাজার। কিন্তু আদিকালে সে রকম কোনো রাজা ছিলেন না বা রাজার দরকার ছিল না। তার কারণ সেকালে সে রকম কোনো বিশাল রাজ্যই ছিল না। থাকবে কী করে! বিশাল রাজ্য হতে হলে তো অনেক অনেক মানুষ থাকতে হয়; তাও আবার এক জায়গায়। সে রকম অবস্থা মানবজাতির এক লক্ষ বছরের ইতিহাসেও ছিল না। তার আগের কথা তো বাদই দিলাম।

বলেছিলাম রাজ্য তৈরি হতে অনেক মানুষ এক জায়গায় থাকতে হয়; আর সে রকম অবস্থা মানুষের ইতিহাসে

বহুকাল ছিল না। মানুষেরা কেন এক জায়গায় থাকত না সে ব্যাপারেও তোমার বোধ হয় কিছুটা জানা আছে। তুমি তো জানো যে হাজার হাজার বছর আগে মানুষ বনেজঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফলমূল খুঁজে নিয়ে আর পশুপাখি শিকার করে নিজেদের খাবার জোগাড় করেছে। তাই তাদের পক্ষে এক জায়গায় বসবাস করা সম্ভব ছিল না। যারা ঘুরে ঘুরে জীবনযাপন করে তাদেরকে বলা হয় যাযাবর। আর মানুষের ইতিহাসের এই রকম সময়টাকে বলা হয় যাযাবর জীবনকাল। পরে যখন মানুষ জমি চাষ করে ফসল ফলাতে শুরু করল তখন থেকে শুরু করল এক জায়গায় বসবাস করা। এভাবেই একটা নির্দিষ্ট জায়গায়, বিশেষ করে যেখানে যেখানে চাষাবাদের সুবিধা বেশি সেখানে সেখানে মানুষ বেশি বেশি সংখ্যায় জড়ো হতে থাকে। আর এভাবেই, হয়তবা মাত্র নয় বা দশ হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল কৃষিভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার অর্থাৎ হয়েছিল মানুষের কৃষিভিত্তিক জীবনকালের সূচনা।

এখন একটা কথা খেয়াল কর! যখন তুমি ঘরে একলা থাক তখন যেমন ইচ্ছে তেমনভাবে থাকতে পারো। কিন্তু যখন তোমাদের তিন-চারজন ভাইবোনকে একই ঘরে থাকতে হয় তখন কি যেমন ইচ্ছে তেমন করে থাকা যায়? তখন কিছু নিয়মকানুন তৈরি করে নিতে হয় যাতে সবার সুবিধা নিশ্চিত করা যায়, কারো অসুবিধা না হয়, তাই না? এ ক্ষেত্রে সাধারণত যে সবার মধ্যে বড়ো সে দায়িত্ব নেয় সবার দেখাশোনা করার। অথবা, ভেবে দেখো তোমার পরিবারের কথা। এখানে কোনো বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তো একজনই নেন, হয় বাবা অথবা মা। সে রকমই যখন এক জায়গায় অনেক মানুষ থাকা শুরু করল দলবেঁধে তখন তৈরি করে নেওয়া হলো একজন দলনেতা।

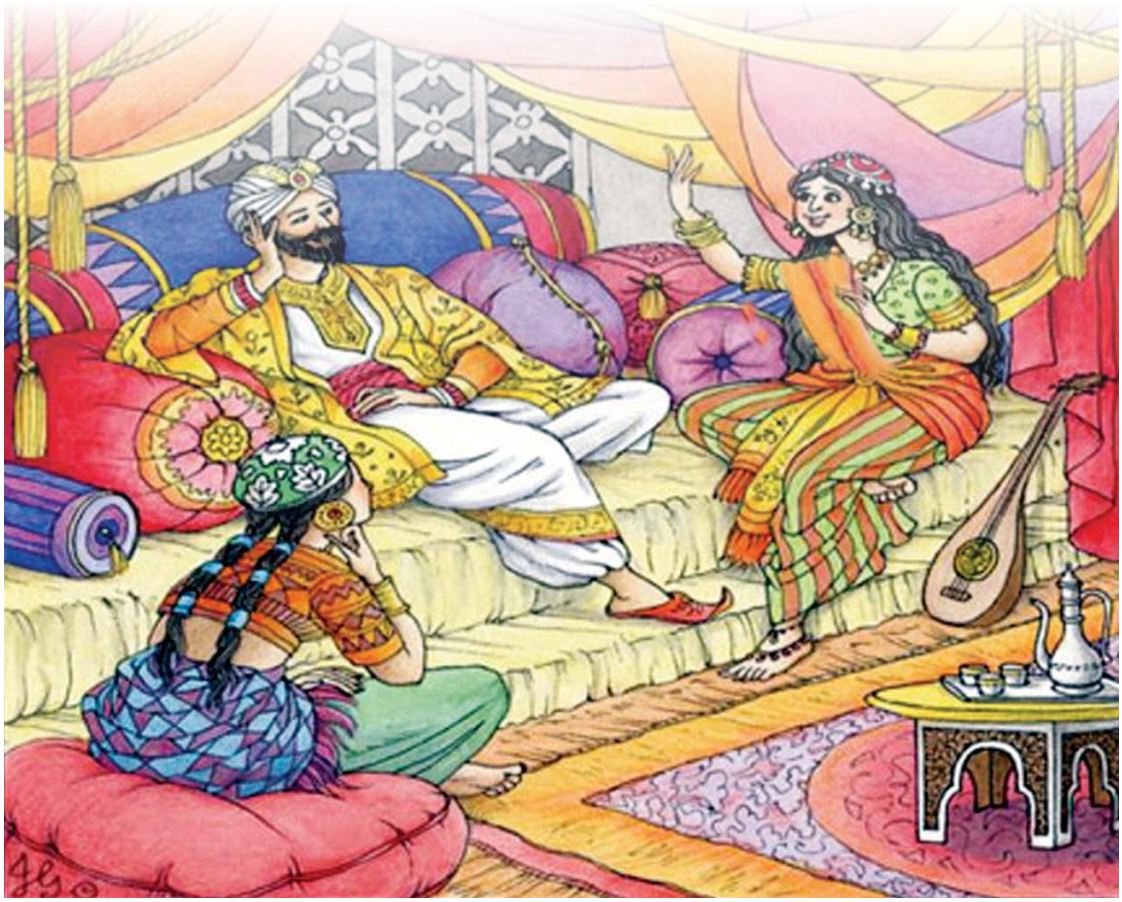

অন্যভাবে বললে এক এক গোষ্ঠীর এক একজন গোষ্ঠী প্রধান। তারপরে বিভিন্ন গোষ্ঠী যখন একই জায়গায় পাশাপাশি থাকা শুরু করল তখন দরকার পড়ল এইসব প্রধানদের মধ্যে থেকে একজনকে প্রধান করার। এদের নাম দেওয়া হলো জমিদার বা রাজা। এসব রাজার এলাকা এখনকার হিসেবে এক একটা ছোটো ছোটো গ্রাম অথবা জেলাও হতে পারত। কী কী পদ্ধতিতে একটা রাজ্যের একজন রাজা তৈরি হতেন তার বিস্তারিত কথায় একটু পরে আসি। তার আগে এসো জেনে নেই কবে একটা বিশাল রাজ্য এই পৃথিবীতে গড়ে উঠল।

...রাজ্য তৈরি হতে অনেক মানুষ এক জায়গায় থাকতে হয়; আর সে রকম অবস্থা মানুষের ইতিহাসে বহু কাল ছিল না। মানুষেরা কেন এক জায়গায় থাকত না সে ব্যাপারেও তোমার বোধহয় কিছুটা জানা আছে। তুমি তো জান যে হাজার হাজার বছর মানুষ বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে ফলমূল খুঁজে নিয়ে আর পশুপাখি শিকার করে নিজেদের খাবার জোগাড় করেছে।

ইতিহাসবিদরা যে সব লিখিত তথ্য পেয়েছেন এখন পর্যন্ত তাতে জানা যাচ্ছে যে মাত্র পাঁচ হাজার বছর আগে প্রাচীনকালের মেসোপটেমিয়ায় অর্থাৎ বর্তমান কালের ইরাক দেশটি যে, এলাকায় সেখানে সুমের নামে একটি দেশ বা রাজ্য ছিল। প্রথম দিকে অবশ্য একটা রাজ্য ছিল না, ছিল ছোটো ছোটো অনেকগুলো নগর রাজ্য বা রাষ্ট্র। নগররাষ্ট্র বলতে কী বোঝাচ্ছি তা বুঝেছ নিশ্চয়ই। হ্যাঁ, আমাদের এখনকার ছোটো ছোটো শহরের মতোই ছিল তখনকার এক একটা রাজ্য। পুরাতত্ত্বের তথ্য থেকে পাওয়া ব্যাখ্যা অনুযায়ী ঐ সব নগররাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল প্রধান মন্দির বা উপাসনালয়কে ঘিরে। অথবা বলা যায় যখনই কিছু মানুষ এক জায়গায় থাকা শুরু করতেন তখনই তারা ঠিক করতেন যে একজন দেবতা দরকার তারা যার পূজা করবেন; বিনিময়ে যিনি মানুষকে তাদের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং সহায় সম্পদ দিয়ে সাহায্য করবেন। এছাড়া দরকার একটা ঘর বা স্থাপনা যেখানে তারা সেই দেবতার পূজা করবেন। সেই স্থাপনাটাই হতো মন্দির আর কোনো গণ্যমান্য বা জ্ঞানীগুনি ব্যক্তি হতেন প্রধান পূজারি বা পুরোহিত। অনেক ক্ষেত্রেই দেশের প্রধানই মন্দিরের প্রধান হতেন। অর্থাৎ রাজা নিজেকে দেবতা বা ঈশ্বর বলে ঘোষণা করতেন এবং সবার আনুগত্য আদায় করতেন। অনেক ক্ষেত্রে দুজন আলাদা ব্যক্তি এই দুটো পদের অধিকারী হতেন। রাজা রাজ্য শাসন করতেন বটে কিন্তু তিনি প্রধান পুরোহিতকে খুব শ্রদ্ধা করতেন, তাঁর উপদেশ-নির্দেশ মেনে চলতেন; কারণ তারা বিশ্বাস করতেন যে পুরোহিতের কাছে ঈশ্বরের দেওয়া জ্ঞান আর শক্তি আছে। সে যাই হোক, কোনো কোনো সময় কোনো এক শক্তিশালী রাজা পাশের ছোটো ছোটো নগররাষ্ট্রের আনুগত্য আদায় করে নিয়ে নিজের রাজ্যকে বড়ো করে ফেলতেন। আর এভাবেই সুমের এলাকায় গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর প্রথম বিশাল রাজ্য।

এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল যিশু খ্রিষ্টের জন্মের প্রায় সাড়ে চার হাজার বছর পূর্বে। তার মানে আজ থেকে প্রায় সাড়ে ছয় হাজার বছর আগে। আর এও বলেছিলাম যে এই রাজ্যটি গঠিত হয়েছিল বেশ কিছু ছোটো ছোটো রাজ্যকে একত্র করে। এক সময় আবার এই রাজ্যটি দখল করে নেন মেসোপটেমিয়ারই উত্তরাঞ্চলের আক্কাদ রাজ্যের রাজা। ফলে আক্কাদ রাজ্যটি বিশাল থেকে বিশালতর হয়ে যায়, আর রাজ্য যখন বিশালতর হয় তখন তাকে বলা হয় সাম্রাজ্য। আক্কাদীয় সাম্রাজ্য মেসোপটেমিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে নিয়ে দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইতিহাসবিদরা বলেন, আক্কাদীয় সাম্রাজ্যই হলো পৃথিবীর প্রথম সাম্রাজ্য।

রাজা হতে হলে আর রাজত্ব ধরে রাখতে হলে একটা বিষয়ের খুব দরকার হয়। সেটা হলো সৈন্যসামন্ত আর অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ সামরিক শক্তির। সব সময়ই যে-কোনো জনপদের সবচেয়ে জ্ঞানীগুণী বা বয়স্ক ব্যক্তি সেই জনপদের নেতা হয়েছেন, এমন কিন্তু নয়।

যার কাছে অস্ত্রশস্ত্র এবং সেগুলো চালাতে পারার মতো লোকজন থাকে তিনি অন্যদের উপর হুকুম চালাতে পারেন, অন্যদেরকে হুকুম মানতে বাধ্য করতে পারেন। এভাবে যখন কেউ অনেক বড়ো জনপদের নেতা হয়ে উঠেছেন তখন তাঁকে রাজা বলা হয়েছে। মনে আছে সেই সুপ্রাচীন কালের সুমের রাজ্যের রাজার কথা? তিনি তো আশপাশের ছোটো ছোটো নগরের নেতাদেরকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েই নিজে বড়ো রাজা হয়েছিলেন। আবার আক্কাদ নগরের রাজা সুমেরের রাজার চেয়ে সামরিক শক্তিতে বেশি শক্তিশালী হয়েছিলেন বলেই সুমেরের রাজাকে হারিয়ে দিয়ে আক্কাদীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন! সুতরাং বুঝতে পারছ, রাজা হওয়ার এবং রাজ্য ক্ষমতা ধরে রাখার একটা বড়ো নিয়ামক হলো সামরিক শক্তি। এটা যে কেবল প্রাচীনকালের ব্যাপারে সত্য তা কিন্তু নয়, সব কালেই ঘটেছে, এখনো ঘটছে। তবে এখন রাজ্যের সঙ্গে রাজ্যে যুদ্ধ লাগে না, কারণ রাজ্য নেই।

আবার যারা রাজা হয়েছেন তাদের সন্তানেরাই যে পরবর্তীতে রাজা হয়েছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তেমন নয়। কিন্তু সামরিক শক্তির ভিত্তিতে রাজা হলে অন্য রাজা তাকে হারিয়ে না দিলে তার ছেলেই পরে রাজা হয়েছেন উত্তরাধিকার সূত্রে এবং তা চলতে থেকেছে। আর এভাবেই তৈরি হয়েছে রাজবংশ। আমাদের দেশেও শাসন করেছে সে রকম একটি রাজবংশ মুঘল রাজবংশ। প্রায় সাড়ে তিনশ বছর শাসন করেছে মুঘলরা ১৫২৬ থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত। ইংরেজরা শেষ মুঘল সম্রাট বাহাদুর শাহ্‌কে হারিয়ে দিয়ে আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে নেয় আর আমরা সবাই ইংল্যান্ডের রাজার প্রজা

অর্পিতা রায় বর্মন, চতুর্থ শ্রেণি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

হয়ে যাই। দুশ বছরের মধ্যেই অবশ্য আমরা আবার তাদেরকে হটিয়ে দিয়ে স্বাধীন হয়ে গিয়েছিলাম। ইংল্যান্ডে কিন্তু সেই রাজবংশ এখনো রাজত্ব করছে। তবে ধরনটা একটু বদলে গেছে।

আমাদের দেশে, অর্থাৎ বঙ্গদেশে অন্য একটা পদ্ধতিতে রাজা হওয়ার ইতিহাস আছে। সেটার কথা বলব এখন। সাতশ সালের দিকে এ দেশে বেশ শক্তিশালী রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। তিনি ৫৯০ থেকে ৬২৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পরে শক্তিশালী রাজার অভাবে গণ্ডগোল চলছিল সারা দেশে। সে সময় বেশ কিছু গোষ্ঠী প্রধানেরা মিলে গোপালকে নির্বাচন করেন রাজা হিসেবে। তিনি কোনো রাজপুত্র ছিলেন না, ছিলেন একজন সৈনিকের ছেলে। এই নির্বাচনটি পরে সব গোষ্ঠীপ্রধান মেনে নিয়েছিলেন। গোপালও যথেষ্ট দক্ষতার সঙ্গে রাজ্য শাসন করেছেন, অনেক জনকল্যাণমূলক কাজ করেছেন আর প্রতিষ্ঠা করেছেন একটি নতুন রাজবংশ যেটি পাল রাজবংশ। এই রাজবংশ প্রায় চারশ বছর রাজত্ব করেছিল।

এবার শোনো, রানিদের কথা শোনো। এতক্ষণ যে সমস্ত কথা বললাম তাতে মনে হতে পারে যে শুধু রাজপুত্র বা রাজার ছেলেরাই রাজা হন আর তাদের স্ত্রীরা হন রানি। কিন্তু ইতিহাসে অন্যরকম ঘটনাও আছে। রাজার মেয়েরাও অর্থাৎ রাজকন্যারাও শাসনকর্তা হিসেবে রানি হয়েছেন অনেক জায়গায়। সেই সুপ্রাচীন কালে সুলায়মান নবির আমলে অর্থাৎ খ্রিষ্টপূর্ব সাড়ে নয়শত বছরের দিকে সিবা নামক রাজ্যে বিলকিস নামে একজন রানি ছিলেন। বেশ সমৃদ্ধশালী ছিল তার রাজ্য। একজন সফল রানি অর্থাৎ শাসক ছিলেন তিনি। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে ১২৩৬ সালে একজন নারী শাসনকর্তা অর্থাৎ রানি হয়েছিলেন দিল্লির রাজ সিংহাসনে। তার নাম ছিল রাজিয়া বেগম; তাকে সুলতানা রাজিয়া বলা হতো। তিনি ছিলেন দিল্লির রাজা শামস-উদ্দিন ইলতুতমিশের মেয়ে। আরো বেশ কিছু রানি ছিলেন ভারতে। তাদের মধ্যে একজন হলেন মহারাষ্ট্রের ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাই। তিনি ১৮২৮ সাল থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। ইংল্যান্ডে তো এখনো রাজত্ব করছেন একজন রানি, যাঁর নাম এলিজাবেথ।

কী কাণ্ড বলো তো! এক রাজা, এক রানি আর এক রাজকন্যার গল্প বলতে গিয়ে অন্য কথায় এসে কত কথা বলে ফেললাম! গল্পটাই শেষ করা হলো না! আচ্ছা, বরং এক কাজ করো! তুমি নিজেই নিজের মতো করে গল্পটা তৈরি করে ফেলো। বেশ মজা হবে তাহলে! তাই না?

আমরা সবাই রাজা

নূরুল হক

সাতটা আকাশ চাই না আমি এ আকাশটা আমার
এই আকাশে গড়ব আমি সাদামনের খামার
ছড়ার বীজে উঠবে বেড়ে শান্তি নামের বৃক্ষ
এই আকাশকে আর বলো না ধূলির অন্তরীক্ষ

এ আকাশের হীরক জ্বলা নীলের জলে
এ আকাশের বিজলি চমক মেঘের তলে
এ আকাশের তারার সাথে রাত্রিবেলা
উদাস হয়ে সবাই মিলে খেলব খেলা

এ আকাশে বানের জলে ঘটবে না আর ফসল হানি
এ আকাশে যানের জটে ঝরবে না আর চোখের পানি
এ আকাশে চলবে না আর চোখ রাঙানো রাহাজানি
মুক্ত বাতাস ফুলের গন্ধে উঠবে ফুলে হৃদয়খানি

সাতটা আকাশ চাই না আমি এই আকাশ হোক সবার
এই আকাশ হোক ফুল পাখিদের হাসনাহেনা জবার
এই আকাশে আমরা শিশু আমরা সবাই রাজা
মন খুশিতে খুশির দিনে বাজারে ঢোলক বাজা।

ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

বিশ্বজুড়ে ব্যাপক জনপ্রিয় রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ যিনি ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারিতে বাবা ষষ্ঠ জর্জের মৃত্যুর পর ২৫ বছর বয়সে বসেছিলেন সিংহাসনে, তারপর পেরিয়ে গেছে ৬৫ বছর। রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সময় ধরে টিকে থাকা ব্রিটিশ রাজত্বের শাসনকর্তা। থাই রাজা ভূমিবল আদুলিয়াদেজের মৃত্যুর পর এখন পর্যন্ত তিনিই বেশি সময় ধরে রাজত্ব পরিচালনা করা ব্যক্তিত্ব।

এর আগে ১৮৩৭ সাল থেকে ১৯০১ সাল পর্যন্ত ৬৪ বছর রাজত্ব করেন রানি ভিক্টোরিয়া। পৃথিবীর প্রবীণতম রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের জন্ম ১৯২৬ সালের ২১ এপ্রিল। তাঁর পিতা ষষ্ঠ জর্জ এবং মাতা এলিজাবেথ বউয়েস। ১৯৩৭ সালে এলিজাবেথের বাবা ষষ্ঠ জর্জ ব্রিটেনের রাজার আসনে বসেন। সে সময় ব্রিটিশ রাজসিংহাসনের পরবর্তী উত্তরাধিকারী ছিলেন রাজকুমারি এলিজাবেথ। স্বাভাবিকভাবেই পিতার মৃত্যুর পর তিনিই হন পরবর্তী রানি।

মাত্র ২৫ বছর বয়সে তাঁর মাথায় উঠে রাজমুকুট। তাঁর শাসনামলে ব্রিটেনে ১৩ জন প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রে ১৩ জন প্রেসিডেন্ট ৬ জন পোপ নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি ১৯৪০ সালে প্রথম রেডিও বিবিসিতে শিশুদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। ১৯৪৩ সালে তিনি প্রথম জনসম্মুখে আসেন এবং ১৯৪৫ সালে সামরিক বাহিনীতে প্রশিক্ষণের জন্য যোগদান করেন।

এলিজাবেথের জীবনসঙ্গী হলেন প্রিন্স ফিলিপ, ডিউক অব এডিনবরা। তাদের চার সন্তান—চার্লস, অ্যানি, অ্যান্ড্রু এবং এডওয়ার্ড।

রানির হাতে সবসময়ই একটি হাতব্যাগ থাকে এবং ব্যাগটি তাঁর পোশাকের সাথে মানানসই হয়। এই ব্যাগের ভিতর সপ্তাহের ১ দিন রবিবারে শুধু টাকা রাখেন। এই টাকা থেকে তিনি চার্চের কালেকশন প্লেটে দান করেন। এছাড়া আরো থাকে তাঁর প্রিয় ক্লারিনস লিপস্টিকের কোনো একটা শেড, মোবাইল ফোন, রিডিং গ্লাস, মিন্ট লজেন্স এবং একটি ফাউন্টেন পেন।

বিরক্তিকর পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য রানি এলিজাবেথের বিশেষ কিছু ইঙ্গিত আছে তাঁর কর্মচারীদের প্রতি। যেমন–তাঁর ব্যাগটি এক হাত থেকে অন্য হাতে নেওয়া, হাতের আংটি ঘোরানো এবং হাত বিশেষ কায়দায় নাড়ানো। রানির ব্যাগ এক হাত থেকে অন্য হাতে নেওয়া মানে তিনি কোনো আলোচনা শেষ করতে চান। কোনো অনুষ্ঠানে রানির হাতব্যাগ টেবিলে উঠানো মানে শীঘ্রই অনুষ্ঠানস্থল ত্যাগ করতে চান। বাম হাতের আংটি যদি ডান হাতের আঙুল দিয়ে ঘোরাতে থাকেন তার মানে দ্রুত বিরক্তিকর কথোপকথন থেকে মুক্তি পেতে চান।

রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ সফর করেছেন ১১৬টি দেশ। কিন্তু এতগুলো দেশ ভ্রমণে রানির কোনো পাসপোর্ট লাগেনি। তোমরা জেনে অবাক হবে ব্রিটেনের রানি এলিজাবেথ দুবার ঢাকায়ও এসেছেন। প্রথমবার এসেছিলেন ১২ ফেব্রুয়ারি ১৯৬১ সালে। তার রাজকীয় বিমান অবতরণ করেছিল পুরানো বিমানবন্দরে। রমনা পার্কের সামনে একটি পুরোনো বাড়ি সাজানো হয়েছিল রানির জন্য। সেই বাড়িটিই এখনকার বঙ্গভবন। ১৩ ফেব্রুয়ারি তিনি জাহাজে করে বুড়িগঙ্গা ভ্রমণ করেন। এরপর তিনি গিয়েছিলেন আদমজি জুট মিলে ।

তাঁর মৃত্যু হলে প্রথমে যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হবে। তা করা হবে বিশেষ কোড ওয়ার্ড বা সংকেতের মাধ্যমে।

ব্রিটিশ সিংহাসন কখনোই উত্তরাধিকার শূন্য থাকবে না। রানির মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ংক্রিয়ভাবে তাঁর বড়ো ছেলে চার্লস রাজা ঘোষিত হবেন। চার্লস রাজা হওয়ার পরই যুক্তরাজ্যের জাতীয় সংগীত বদলে যাবে। এতদিন যেখানে 'গড সেইভ দ্য কুইন' বলা হতো, সেখানে বলা হবে 'গড সেইভ দ্যা কিং'। বদলে যাবে রাষ্ট্রীয় মুদ্রা, সিলমোহর ও স্ট্যাম্পের ছবিও।

দেশ-বিদেশের রূপকথায়

রাজা-রানি

মো. সিরাজুল ইসলাম

এক দেশে ছিল এক রাজা। তার ছিল সাত রানি। টাকশালে টাকা ছিল, ভাণ্ডারে ছিল হীরা জহরত মণিমাণিক্য। হাতিশালে হাতি, ঘোড়াশালে ঘোড়া। পঙ্খিরাজের ঘোড়া ছুটিয়ে এল রাজকুমার .....বন্ধুরা, তোমরা তো এতক্ষণে নিশ্চয়ই চুপটি করে গুটিসুটি মেরে বসে পড়েছ। রূপকথার গল্প শুনবে বলে। হ্যাঁ বন্ধুরা, একটু সবুর করো। আজকে তোমাদের রূপকথার গল্প শোনাবো, *রূপকথার রাজা-রানির* কথা শোনাবো, একটুখানি করে।

অবাস্তব কাল্পনিক কাহিনি, ছেলে ভুলানো অসম্ভব গল্প-ই হলো রূপকথা। লোকমুখে এসব কাহিনি প্রচলিত হয়ে থাকে। এসব গল্পে অলৌকিক সবকিছু ঘটতে থাকে। বাস্তবে যা পাওয়া যায় না, ঘটে না, রূপকথার কল্পনায় তার সবই সম্ভব হয়। আকাশ-মাটি, পাতাল-স্থল, জল-সমুদ্র, নৈকট্য-দূরত্ব সেখানে কোনো বাধা নয়। মানুষ, দৈত্য, দানব, পরি, দেবতা, পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ সবার শত্রুতা মিত্রতা নিয়ে গল্প। সোনার কাঠি, রূপার কাঠি, মন্ত্র শক্তি, জাদু শক্তিতে গল্প গতি পায়। সবার সাথে সবাই কথা কয়। রূপকথার গল্পে সবাই রাজা-রানি হতে পারে। লোকসাহিত্যের অনেকখানি জুড়ে আছে রূপকথা। মানুষের গল্প শুনবার আগ্রহ থেকেই এগুলোর জন্ম। মানুষকে নিয়ে বানানো গল্পগুলো রূপকথা। আর প্রাণী, পশু, গাছপালা, কীট-পতঙ্গ নিয়ে কাহিনিগুলোকে বলে উপকথা। বেতাল পঞ্চবিংশতি, ঠাকুরমার ঝুলি, হ্যান্স ক্রিশ্চিয়ান এন্ডারসন, লিও টলস্টয়ের নীতিগল্প এ রকম অনেক বিখ্যাত সাহিত্য রয়েছে রূপকথায় ভরপুর হয়ে।

তোমরা তো জানো, গল্প তো আর বাস্তব ঘটনা নয়। অনেক গল্পই লোকমুখে বলা কাহিনি। কল্পনা করে বলা। দাদু-নানুর কাছে শোনা। অনেক অনেক দিন ধরে এসব গল্প সারা পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। যা আমরা শুনে আসছি। তবে এসব গল্প প্রায় একই রকম। একেক দেশে শুধু নাম পালটে যায়। এসব রূপকথা হয়ত তোমাদের চেনাও থাকতে পারে।

অহংকার-হিংসা, পরিশ্রম-চেষ্টা, সততা, দৃঢ়তা নিয়ে সাত রানির গল্প ***সাত ভাই চম্পা***, দিয়ে শুরু করা যাক। এক রাজার ছিল সাত রানি। বড়ো ছয় রানি ছিল অহংকারী আর হিংসুটে। তবে ছোটো রানি ছিল খুব ভালো মনের। অহংকার হিংসা কিছু ছিল না।

কোনো রানির কোনো সন্তান হলো না। তাই কারো মনে সুখ নেই। এই রাজ্যের পরবর্তী রাজা কে হবে ?

হঠাৎ খবর এল ছোটো রানির ছেলে হবে। বড়ো ছয় রানি হিংসায় জ্বলতে থাকল। তারা থাকতে ছোটো রানির ছেলে হবে ? তারা কুমতলব আটল। বড়ো ছয় রানি দাইয়ের কাজ করবেন। আর খুশির ভাব দেখাতে থাকলেন। যথাসময়ে ছোটো রানির সাতটা ছেলে আর একটা মেয়ে হলো। ছয় রানি মিলে সাতটি ছেলে আর মেয়েকে হাড়িতে ভরে ছাই গাদায় পুঁতে রাখল। আর ইঁদুর ব্যাঙের সাতটা ছানা এনে ছোটো রানির কোলে শুইয়ে দিল। ছোটো রানির ইঁদুর, ব্যাঙের বাচ্চা হয়েছে জেনে রাজা মশাই ভীষণ দুঃখ পেলেন। ছোটো রানিকে প্রাসাদ থেকে তাড়িয়ে বনবাসে দিলেন। ছোটো রানি ঘুটে কুড়ানি হয়ে দিন কাটাতে লাগল।

একদিন রাজার মালি বাগানে ফুল তুলতে গিয়ে দেখে বনের ভেতর সাতটা চাঁপা আর একটা পারুল গাছ। সব গাছে একটা করে ফুল ফুটেছে। মালি পারুল ফুলটা তুলতে যাচ্ছে, তখনই পারুল গাছ বলে উঠল সাত ভাই চম্পা জাগোরে, কেন বোন পারুল ডাকোরে? মালি হাত বাড়াতেই ফুল উপরে উঠে গেল আর বলল, আসুক রাজা দিব ফুল। রাজা এলে বলল, আসুক সাত রানি দেবো ফুল। ছয় রানি এলে বলল, আসুক ছোটো রানি দেবো ফুল। ছোটো রানি কাছে আসতেই সাতটা চাঁপা আর একটা পারুল গাছ থেকে নেমে *মা* বলে ছোটো রানির কোলে লুটিয়ে পড়ল। ছোটো রানির ছোঁয়া পেয়ে সাতটি ফুল হয়ে গেল সাতটি রাজপুত্র আর একটি রাজকন্যা। রাজা ছয় রানির কারসাজি বুঝতে পারল। ছয় রানিকে ছয়টা গর্তে পুঁতে ফেলা হলো। আদরের ছোটো রানি আর আট সন্তানকে নিয়ে রাজা নিজ রাজ্যে ফিরে মহা সুখে দিন কাটাতে লাগলেন।

ফরাসি রূপকথার গল্পে রয়েছে ***সিনড্রেলার*** রানি হয়ে ওঠার কথা। রূপসি সিনড্রেলা সৎ মা আর সৎ বোনের অবজ্ঞা অবহেলা আর তাদের আদেশ নির্দেশ মতো থালাবাটি মেজে মুখ ভার করে থাকত। একদিন এক পরি এসে তাকে পরামর্শ দিল। পরি মায়ের পরামর্শে সেই রাজ্যের যুবরাজের রাজবধূ বাছাইতে অংশ নিয়ে রাজদরবারে নাচল। রূপে গুণে নাচে রাজপুত্রের মন জয় করল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দ্রুত ফিরে আসার সময় নিজের একটা জুতা রাজবাড়ির সিড়িতে ফেলে এলো। রাজপুত্র লোক পাঠিয়ে রাজ্যময় সেই জুতার পায়ের মাপে সিনড্রেলাকে খুঁজতে থাকল। রাজ্যের সেরা সব সুন্দরি এবং রূপের গরবিনি সৎ মা আর সৎ বোনকে অবাক করে পায়ের মাপে মিলে যাওয়াতে সিনড্রেলাই হয়ে গেল রাজরানি। ঠিকঠাক মতো পরির কথা শুনেছিল, সময় মতো সবকিছু করেছিল। তাই সে সফল হয়েছিল ।

অঙ্গীকার পূরণের গল্প শোনো এবার ***ব্যাঙ রাজকুমার*** গল্পে।

ভারি মিষ্টি এক রাজকুমারী কাঁদতে লাগল হাপুস নয়নে।

বিকেলে বল খেলতে খেলতে তার বলটা পড়ে গেল সরোবরে। ব্যাঙকে বলল: তুমি আমার বল তুলে দাও, যা চাইবে তাই দেবো তোমাকে। এক ডুব দিয়ে ব্যাঙ রাজকুমারীর সোনার বল তুলে দিল। এবার কথা রাখার পালা। ব্যাঙ বলল: আমি তোমার বন্ধু হবো, তোমার

সাথে ঘুমাবো, তোমার থালা থেকে খাবো। রাজকুমারী আসলে কথার কথা বলেছিল। ব্যাঙের বন্ধু সে হতে চায়নি। রাজার কাছে নালিশ করতেই রাজা হুকুম করলেন: কথা দিয়েছ, ও তো রাজপ্রাসাদে তোমার সাথেই থাকবে। কদাকার দেখতে ব্যাঙ সারাক্ষণ রাজকুমারীর সাথে ঘুর ঘুর করে। তার খাবার থালায় খেতে শুরু করে। রাজকুমারী রাগে গড়গড় করে। খাবার রেখে উঠে যায়। রাতে তার বিছানায় শুতে চায় সেই ব্যাঙ। রেগে ব্যাঙকে ধরে দেয়ালে আছাড় দেয় রাজকুমারী। অমনি ব্যাঙ হয়ে যায় ভারি সুন্দর এক রাজপুত্র। এবার রাজকন্যা তো অবাক ! রাজপুত্র বলে: এক ডাইনি বুড়ি জাদু করে আমাকে ব্যাঙ করে রেখেছিল। সে বলেছিল: দেয়ালে আছাড় দিলে আমি আগের চেহারায় ফিরে আসতে পারব। তুমি আমাকে আগের রূপে ফিরিয়ে এনেছ, তুমি আমাকে বিয়ে করবে? রাজকন্যা ঘাড় নাড়ে লজ্জায়। তাদের বিয়ে হলো মহা ধুমধামে। বন্ধুরা দেখলে তো প্রতিজ্ঞা পূরণে ভাগ্য ফেরে।

গল্প তো আর বাস্তব ঘটনা নয়। অনেক গল্পই লোক মুখে বলা কাহিনি। কল্পনা করে বলা। দাদু-নানুর কাছে শোনা। অনেক অনেকদিন ধরে এসব গল্প সারা পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে। যা আমরা শুনে আসছি। তবে এসব গল্প প্রায় একই রকম। একেক দেশে শুধু নাম পালটে যায়।

নিজ কন্যার কাছে উচিত শিক্ষা পেলেন রাজা, ***নুনের মতো ভালোবাসা*** গল্পে।

অনেকদিন আগের কথা। এক রাজার ছিল তিন কন্যা। রাজা তাঁর আদরের বড়ো কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি আমাকে কেমন ভালোবাসো? সে বলল: চিনির মতো ভালোবাসি, মেজো মেয়ে বলল মিষ্টির মতো। ছোটো মেয়েকে জিজ্ঞেস করতেই বলল: সে বাবাকে লবণের মতো ভালোবাসে। রাজা এতে ভীষণ অখুশি হলেন। উজির–নাজির ডেকে ছোটো কন্যাকে বনবাসে পাঠিয়ে দিলেন। সেখানে জনপ্রাণী,মানুষের বসতি নেই। পরিরা রাজকুমারীর দুঃখ বুঝে তার জন্য সুন্দর বাড়ি তৈরি করে দিল। ফুলের বাগান করে দিল। রোজ মজার মজার খাবার এনে দেয়। গভীর অরণ্যে একা দুঃখে তার দিন কাটে।

একদিন রাজা গভীর বনে শিকারে বের হলেন। দিন গড়িয়ে অনেক ক্ষুধা পেয়েছে। বনের কুটিরে সুন্দরি কন্যার কাছে খেতে চাইলে সে অনেক রান্না করল, তবে কোনো খাবারে নুন দিল না। রাজা পরম আগ্রহে সব খাবার মুখে দিয়ে ফেলে দিচ্ছেন। নুন ছাড়া সবই বিস্বাদ। নুন ছাড়া কিছু খাওয়া যায় না বলে ভীষণ বিরক্ত হলেন। তখন বনবাসী কুটিরের কন্যা বলল: আমাকে চিনতে পেরেছ বাবা? আমি তোমার সেই ছোটো কন্যা। যাকে বনবাসে দিয়েছিলে। আমিই বলেছিলাম *নুনের মতো ভালোবাসি*। রাজা ভুল বুঝতে পারলেন। কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। কন্যাকে নিয়ে নিজ রাজ্যে ফিরে গেলেন।

ন্যায়বিচারক রাজার কাহিনি লুকিয়ে রয়েছে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ***সামান্য ক্ষতি*** কবিতায়। কাশির রানি সখীদের নিয়ে শীতকালে স্নান সেরে শরীর গরম করার জন্য দরিদ্র প্রজাদের ঘরে আগুন দেওয়ার আদেশ করলেন। মুহূর্তে পুরো গ্রাম পুড়ে ছাই হয়ে গেল। রাজার কাছে বিচার চাইল প্রজারা। তুমি প্রজাদের ঘর পুড়িয়ে দিয়েছ! রানি অবজ্ঞা করে বলল, ওগুলো ঘর নাকি, ওসব তো জীর্ণ কুটির। রাজা বললেন, গরিব মানুষের জন্য ওগুলোই প্রাসাদ। রাজার হুকুমের দাসি এসে রানির রাজ পোশাক পালটে ভিখারির পোশাক পরিয়ে দিল। অতঃপর রাজা রানিকে আদেশ করলেন, পথে পথে ভিক্ষা করে অর্থ যোগাড় করে ঘরছাড়া প্রজাদের আবার ঘর তৈরি করে দেবে। ঘর তৈরি করে দিতে পারলেই তুমি রাজপ্রাসাদে ফিরে আসতে পারবে। রাজা অন্যায়কারী নিজ রানিকেও শাস্তি দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

খেয়ালি রাজার কথা রয়েছে, রাজার নতুন পোশাক গল্পে।

লিও টলস্টয়ের (রুশ কথাসাহিত্যিক, ১৮২৮-১৯১০) ***তিনটি প্রশ্ন*** গল্পে রয়েছে জ্ঞান অনুরাগী রাজার কথা। রাজার মনে প্রশ্ন এল কীভাবে কাজ করলে তিনি সব সফলতা পাবেন? কোন কাজ এবং সময় গুরুত্বপূর্ণ? আর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি কে ? সভাসদ মন্ত্রিবর্গ বলল: দিন মাস বছর অনুযায়ী কাজের তালিকা করে রাখতে হবে। জ্ঞানী উপদেষ্টাদের তৈরি তালিকার

অগ্রাধিকার অনুযায়ী কাজ করতে হবে। জাদুকরদের পরামর্শ নিতে বললেন। উপদেষ্টা যাজক, চিকিৎসক, সৈনিকদের প্রতি গুরুত্ব দিতে বললেন। বিজ্ঞানে, যুদ্ধ কৌশলে ধর্মীয় বিষয়ে অগ্রাধিকার দিতে বললেন। রাজা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। রাজা সাধারণ পোশাকে একাকী গেলেন গভীর জঙ্গলে নির্জনবাসী সন্ন্যাসীর কাছে। সন্ন্যাসী, রাজার তিনটি প্রশ্নে কোনো উত্তর দিলেন না। নিজের মতো কুটিরের সামনে হাঁপাতে হাঁপাতে গর্ত খুঁড়তে থাকলেন। রাজা দয়াপরবশ হয়ে সন্ন্যাসীর কোদাল নিয়ে মাটি কোপাতে থাকলেন। এমন সময় রক্ত বের হচ্ছে এ রকম গুরুতর আহত একজন দাঁড়িওয়ালা কুটিরের সামনে ছুটে এসে পড়ল। রাজা ছুটে গিয়ে আহত লোকটির সেবা শুরু করলেন। রাজা রুমান সন্ন্যাসীর গামছা দিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। সন্ন্যাসীর বিছানায় দুজন মিলে আহতকে শুইয়ে দিলেন। রাজাকে একাকী জঙ্গলের পথে হত্যা করতে আসা লোকটির প্রাণ বাঁচালেন রাজা। প্রাণঘাতি শত্রু হয়ে গেল বন্ধু।

সন্ন্যাসী এবার রাজাকে বললেন 'তোমার প্রশ্নের উত্তর ইতোমধ্যেই দেওয়া হয়ে গেছে'। আমার ক্লান্তি দেখে আমার কোদাল ধরে আমার কাজে সাহায্য করেছ ঐ কাজটাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ। আমি ছিলাম গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আর ঐ কাজের সময়টাই ছিল গুরুত্বপূর্ণ সময়।

আহত লোকটার সেবা করা ছিল গুরুত্বপূর্ণ কাজ, আহত লোকটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি আর ঐ সেবা করার সময়টা ছিল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সময়।

বন্ধুরা, বর্তমান সময়টাই হলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। কেননা, এই সময়েই আমাদের সামর্থ থাকে কিছু করার। বর্তমান সময়ের সঙ্গীর প্রতি দায়িত্ব পালনই হলো কর্তব্য। কাজেই বর্তমান সময়কে আমরা ঠিক ঠিক কাজে লাগাবো। সময়মতো সব কাজ করব। আজকে যে কাজ পারব তা কালকের জন্য রেখে দেবো না। ঠিক সময়ে লেখাপড়া, খেলাধুলা, বিনোদন সব করব। অদম্য চেষ্টা আর দৃঢ় মনোবল নিয়ে লেগে থাকলে ,আমরা সফল হতে পারব রূপকথার রাজার মতোই।

মনে রাখতে হবে বানিয়ে বলা গল্প হলেও এসব গল্পের ভিতর দিয়ে আমাদের শেখার জন্য বার্তা থাকে। এই ধরো রাজা রাজ্য জয় করার জন্য কী কী কৌশল করেছিল। রাজকুমারীকে পাওয়ার জন্য রাজকুমার কত কঠিন পণ করেছিল। কুঁড়েঘরে থেকে কী গুণ নিয়ে ছোট্ট মেয়েটি এক সময় রাজরানি হয়ে গেল। দেবদূতের কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করে ছিনিয়ে নিল সফলতার মুকুট। সত্যি কথা বলে বিপদ থেকে রেহাই পেল। এই রকম। রূপকথার রাজা -রানির গল্প আজ এ পর্যন্তই থাক।

তথ্যসূত্রঃ

১. ডক্টর **মযহারুল** ইসলাম, ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন, অবসর, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১৫
২. জাহেদুর রহমান সোহেল (সম্পাদনা) চিলড্রেন ফেয়ারী টেলস, গাজী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৭
৩. ঠাকুর মার গল্প সমগ্র,হিমু প্রকাশন, ঢাকা
৪. মুন্সী তাজীম মাহমুদ, শিক্ষার্থী, খুলনা পাবলিক কলেজ, খুলনা।

বাংলাদেশে রাজার শাসন

শাহানা আফরোজ

চাকমা রাজার বাড়ির একাংশ

ছোট্ট বন্ধুরা, রাজা দেখতে চাও? চলে যাও পার্বত্য চট্টগ্রামে। পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি, খাগড়াছড়িতে এখনো রয়েছে রাজ প্রথা। শত শত বছর ধরে পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগোষ্ঠী তিন রাজার আদেশ-নির্দেশ মেনে আসছে। স্থায়ী বাসিন্দাদের সনদ প্রদান, কর আদায়, সামাজিক কিছু বিচার-আচার করা ছাড়া তাদের তেমন কোনো কাজ নেই। পাহাড়ের রাজারা সরকারি খাতায় চিফ সার্কেল নামে পরিচিত। প্রয়োজন ফিকে হলেও পার্বত্য তিন জেলায় টিকে আছে এই প্রতীকী রাজ প্রথা। তবে তিন রাজার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। ব্রিটিশ সরকার ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামকে চাকমা, বোমাং ও মং এই তিনটি সার্কেলে বিভক্ত করে। বোমাং সার্কেল বান্দরবানে, চাকমা সার্কেল রাঙামাটিতে এবং মং সার্কেল খাগড়াছড়িতে অবস্থিত।

মং রাজবাড়ি

চাকমা এবং মং সার্কেলের নিয়ম অনুসারে রাজ পরিবারের বড়ো ছেলে বংশ পরম্পরায় রাজা হিসেবে অভিসিক্ত হলেও বান্দরবানের বোমাং সার্কেলে বংশের সবচেয়ে বয়স্ক জনই রাজা হয়ে থাকেন। পূর্বে রাজার ছেলে রাজা হতো কিন্তু কোনো কোনো রাজার মৃত্যুর সময় পুত্র সন্তান না থাকায় নানা রকম দ্বন্দ্ব হতো। পরে এই রীতি পরিবর্তন করে সমাজের বয়োজ্যেষ্ঠ এবং উপযুক্ত ব্যক্তি রাজা হিসেবে অভিসিক্ত হন। বর্তমানে

চাকমা রাজা

বোমাং রাজা

মং রাজা

রাঙামাটিতে চাকমা রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়, বান্দরবান বোমাং সার্কেলের রাজা উ চ প্রু চৌধুরী এবং খাগড়াছড়িতে মং রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন সাচিং প্রু চৌধুরী।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, ১৯৭৭ সালের ২৫শে নভেম্বর রাঙামাটিতে দেবাশীষ রায় আনুষ্ঠানিকভাবে রাজা হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি চাকমা সার্কেলের ৫১তম রাজা। রাজা হয়েও দেবাশীষ রায় যুক্তরাজ্যে থেকে বার অ্যাট-ল ডিগ্রি অর্জন করেন। বান্দরবানের বোমাং রাজা উ চ প্রু চৌধুরী ১৭তম রাজা। ২০১৩ সালের ২৪শে এপ্রিলে এই রাজা অভিসিক্ত হন। খাগড়াছড়িতে মং সার্কেলের বর্তমান রাজা সাচিং প্রু। রাজা পাই হ্লা প্রু চৌধুরীর মৃত্যুর পর সে মাসেই সাচিং প্রু রাজা নিযুক্ত হন। তিনি মং সার্কেলের নবম রাজা। ২০০৯ সালে তিনি রাজা হিসেবে অভিসিক্ত হন। চাকমা সার্কেলে ১৭৮টি মৌজা, বোমাং সার্কেলে ১০৯টি এবং মং সার্কেলে ১০০টি মৌজা রয়েছে। হেড ম্যানরা প্রতি মৌজার প্রধান হিসেবে কাজ করে থাকেন। প্রতিটি পাড়ায় রাজার প্রতিনিধি রয়েছে একজন করে কারবারি। রাজা হেডম্যান এবং কারবারিদের নিয়োগ দিয়ে থাকেন। আর হেডম্যান এবং কারবারিরা সংশ্লিষ্ট এলাকার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাসহ কর আদায় করে থাকেন। প্রতি বছর শীত মৌসুমে তিন রাজা রাজ পুণ্যাহর আয়োজন করে থাকেন। আর এ সময় প্রজারা তাদের জমির খাজনা দিয়ে থাকেন। এ উপলক্ষে আয়োজন করা করা হয় রাজকীয় অনুষ্ঠান।

বোমাং রাজবাড়ির পুরাতন সিংহদ্বার

বাংলাদেশের এই রাজাদের তেমন কোনো ক্ষমতা না থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামে বেড়াতে আসা পর্যটকদের এখনো আকর্ষণ করে রাজ প্রথা এবং রাজাদের পুরনো ইতিহাস। তাই দেশ-বিদেশ থেকে যারাই বেড়াতে আসেন সবাই এক নজর হলেও দেখে যান রাজবাড়ি। সম্ভব হলে দেখা করেন রাজার সাথে।

রাজার চিঠি

সৈয়দা রওনক জাহান সেঁজুতি নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলার প্রমিস চাইল্ড একাডেমির দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। সেঁজুতি দুই ভাই আর এক বোনসহ বাবা-মার সাঙ্গে থাকে মোগরাপাড়া গ্রামে। ২০১৬ সালে ২রা ডিসেম্বর মারা যায় সেঁজুতির দাদু জুলেখা খাতুন। দাদুর মৃত্যু মেনে নিতে পারেনি সেঁজুতি। সবার মাঝেই খুজে ফিরছিল দাদুকে।

সেঁজুতির চিঠি

৭৮৬

২৫-৩-১৮
মোগরাপাড়া

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা,
আস্সালামু আলাইকুম। তুমি কেমন আছ? দাদুকে হারিয়ে আমি ভালো নেই। তোমার মুখ আমার দাদুর মুখের মতো। বিশেষ করে তোমার নাক আমার দাদুর নাকের মতো। তাই আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। তোমাকে টিভিতে দেখলে আমার দাদুর কথা মনে পড়ে। আমি দ্বিতীয় শ্রেণিতে পড়ি। তুমি আমাদের বাসায় বেড়াতে এসো।

ইতি
তোমার স্নেহের
সেঁজুতি

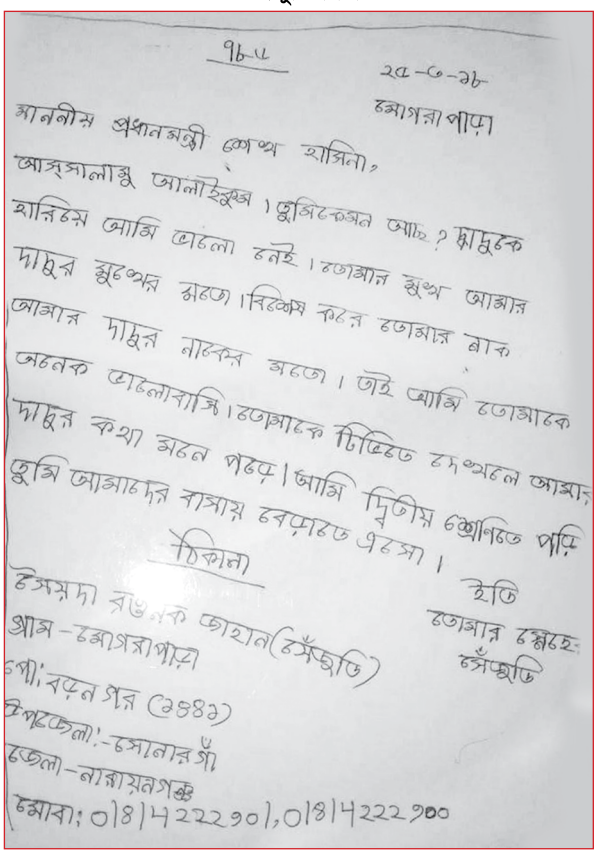

ঠিকানা
সৈয়দা রওনক জাহান (সেঁজুতি)
গ্রাম - মোগরাপাড়া
পো: বড়নগর (১৪৪১)
উপজেলা: - সোনারগাঁ
জেলা - নারায়নগঞ্জ
মোবা: ০১৮১৪২২২৭০১, ০১৮১৪২২২৭০০

অবশেষে খুঁজেও পেল। সেঁজুতি তার দাদুকে খুঁজে পেয়েছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার মাঝে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার চেহারার সাথে তার দাদুর চেহারার অনেক মিল। টেলিভিশনে দেখে সেঁজুতির এমনই মনে হয়েছে। সেঁজুতি তার এই আনন্দকে ভাগাভাগি করে নিতে লিখে ফেলল চিঠি আর পাঠিয়ে দিল প্রধানমন্ত্রীর কাছে। চিঠিটি পড়লেই বুঝা যায় দাদুর প্রতি তার ভালোবাসা কত গভীর।

প্রধানমন্ত্রী ছোট্ট সেঁজুতির চিঠি পেয়ে নিজের একটি ছবিসহ পাঠিয়ে দিলেন চিঠির উত্তর।

প্রধানমন্ত্রীর চিঠির উত্তর

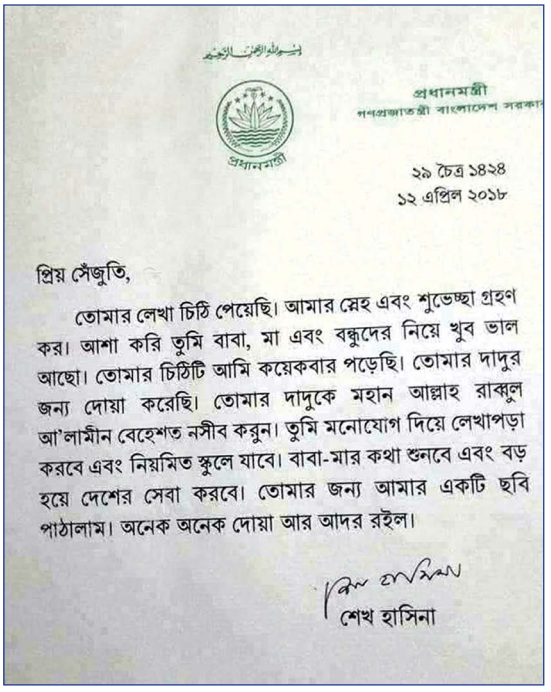

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৯ চৈত্র ১৪২৪
১২ এপ্রিল ২০১৮

প্রিয় সেঁজুতি,

তোমার লেখা চিঠি পেয়েছি। আমার স্নেহ এবং শুভেচ্ছা গ্রহণ কর। আশা করি তুমি বাবা, মা এবং বন্ধুদের নিয়ে খুব ভাল আছো। তোমার চিঠিটি আমি কয়েকবার পড়েছি। তোমার দাদুর জন্য দোয়া করেছি। তোমার দাদুকে মহান আল্লাহ রাব্বুল আ'লামীন বেহেশত নসীব করুন। তুমি মনোযোগ দিয়ে লেখাপড়া করবে এবং নিয়মিত স্কুলে যাবে। বাবা-মার কথা শুনবে এবং বড় হয়ে দেশের সেবা করবে। তোমার জন্য আমার একটি ছবি পাঠালাম। অনেক অনেক দোয়া আর আদর রইল।

শেখ হাসিনা

শত ব্যস্ততার মাঝেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছোট্ট ও অবুঝ এই শিশুর আবেগ ভালোবাসাকে ক্ষুণ্ন না করে চিঠির উত্তর দেন। এ বছরের ২৫শে মার্চ প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখে সেঁজুতি। বাবা সৈয়দ রফিকুল ইসলাম চিঠিটি পোস্ট করেন ২৭শে মার্চ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চিঠির উত্তর দেন ১২ই এপ্রিল। ২২শে এপ্রিল সেজুতির বাড়িতে চিঠি পৌঁছে দেন ডাকপিয়ন। প্রধানমন্ত্রীর এই ভালোবাসায় কৃতজ্ঞতার হাসি ফুটেছে সেঁজুতি আর তার পরিবারের মুখে। বাদ যায়নি দেশের মানুষও।

আমরা সবাই রাজা

বিন্দু সাহা

ভোর হতেই পাখিরা কিচিরমিচির শুরু করে। হইচই করে চারদিক মাতিয়ে তোলে দুরন্ত শিশুর দল।

সুবাস ছড়াতে ছড়াতে পাপড়ি মেলে ধরে ফুল। প্রজাপতিরা এক ফুল থেকে অন্য ফুলে ছুটতে থাকে। রাজ্যে যে একজন রাজা আছেন, কারোই তাতে কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলা তো চলতে দেওয়া যায় না। তাতে যে রাজার মানসম্মান থাকে না। রাজ্যের প্রতিটি কাজ হবে রাজার ইচ্ছা মাফিক। রাজা যখন চাইবে পাখিরা ডাকবে, রাজার ইচ্ছায় ফুল ফুটবে,

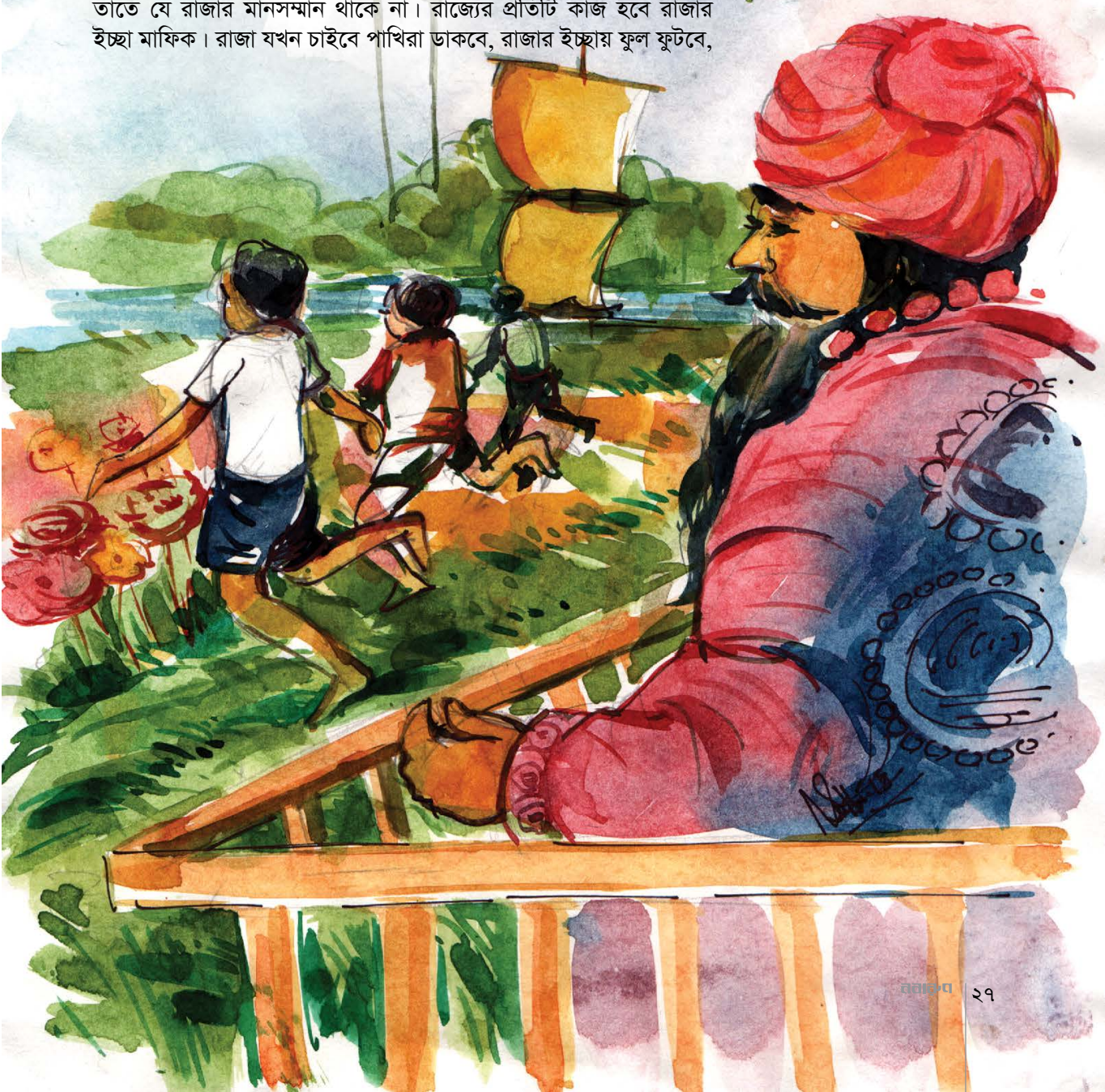

প্রজাপতি উড়বে, দুরন্ত শিশুর দল ছোটাছুটি করবে, তবেই না মনে হবে রাজ্যে রাজার শাসন চলছে। যেই ভাবা সেই কাজ। রাজ্যে যত রাজকর্মচারী আছে তারা ঢাকঢোল পিটিয়ে, সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে রাজার এই আদেশ সর্বত্র প্রচার করে দিল। রাজার আদেশ ছাড়া এই রাজ্যে কিছুই হবে না। রাজার আদেশ বলে কথা। ফুল, পাখি, প্রজাপতি সবাই চুপ হয়ে গেল। দুরন্ত শিশুদের আঁচলে লুকিয়ে ফেলল মায়েরা।

পরদিন ভোর হলো। অন্য রকম ভোর। পাখি ডাকল না। পাপড়ি মেলে সুবাস ছড়ালো না ফুল। নদীর ঢেউ শান্ত হয়ে রইল। সবকিছু কেমন নীরব, সুনসান। রাজার মন্ত্রী এসে খবর দিল, রাজা মশাই, সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। আপনার আদেশ ছাড়া গাছের পাতাটি পর্যন্ত নড়ছে না। শুনে রাজা মশাই খুব খুশি। কিন্তু পরদিন রাজপ্রাসাদে সবাই খুব দেরিতে এল।

রাজার সেবিকা রাজাকে প্রতিদিন ফুলের মালা আর চন্দন পরাতে আসে। কিন্তু আজ সে শুধু চন্দন পরিয়ে গেল। রাজ্যের কোথাও ফুল ফুটেনি। সূয্যিমামার ঘুম ভাঙলেও মন ভালো নেই। প্রতিদিন তার তো ফুল আর পাখিদের সাথে দেখা করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আজ তাদের দেখাই পাওয়া গেল না। তাই সারাদিনে সূর্যের মুখে হাসিও ফুটল না। সূর্যের আলো তেমন দেখা গেল না। এভাবে দুইদিন কাটল, কোথাও প্রাণ চাঞ্চল্য নেই। সূয্যিমামা কখন ঘুম থেকে ওঠে, কখন ভোর হয় তা কেউ ঘরে থেকে বুঝতে পারে না। তাই রাজার সভাসদ রাজকর্মচারীদের কাজে যেতে দেরি হয়ে যায়। রাজা তার মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে অনেক সলাপরামর্শ করে ঠিক করলেন মস্ত এক ঘণ্টা বানাবেন। প্রতিদিন ভোর হলেই সেই ঘণ্টা বাজবে। আর তার আওয়াজ শুনে সবাই জেগে উঠবে। তখন কারো কাজে আর ক্ষতি হবে না।

শুরু হয়ে গেল ঘণ্টা তৈরির কাজ। বিরাট এক ঘণ্টা তৈরি করা হলো। ভোরে ঘণ্টা বেজে ওঠল। আর আওয়াজ শুনে জাগল রাজ্যের সব মানুষ। শিশুদের মন এতদিন খারাপ ছিল। ফুল, পাখির গান আর প্রজাপতি ছাড়া কি ভালো লাগে? আজ রাজার এই নির্বোধ স্বেচ্ছাচারিতা দেখে শিশুরাও হেসে ওঠল। রাজার প্রতি দুরন্ত শিশুদের এই উপহাস রাজার কানে গিয়ে পৌঁছালো।

রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে সেই শিশুদের ধরে আনতে আদেশ দিলেন রাজা। ধরে আনা হলো রাজ্যের দুরন্ত কয়টি শিশুকে। রাজসভায় বিচার বসল। কারা রাজাকে উপহাস করেছে, কারা রাজাকে বলেছে নির্বোধ? শিশুরা সব চুপ, রাজা শিশুদের সময় দিলেন দুইদিন। এর মধ্যে তাদের দোষ স্বীকার করতে হবে। নয়ত তাদের সবাইকে শুলে চড়ানো হবে। কারারক্ষীরা দুরন্ত শিশুদের নিয়ে গেল কারাগারে। তাদের মায়েরা অনেক কান্নাকাটি করল। কিন্তু রাজার মন গলল না। শেষে যে শিশুরা রাজাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা করেছিল, তারা ঠিক করল অন্য শিশুদের বাঁচাতে তারা দোষ স্বীকার করবে।

দুরন্ত শিশুরা দোষ স্বীকার করবে- রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল এ খবর। ফলে তাদের হবে মৃত্যুদণ্ড। রাজার এই স্বেচ্ছাচারিতায় সবাই রেগে গেল। সূয্যি মামা ঠিক করল এ রাজ্যে আর কখনো মুখ দেখাবে না। চাঁদমামাও ঠিক করল, রাজ্যে জোছনার মায়াবি আলো আর ছড়াবে না। বাতাস ঠিক করল এই রাজ্যে আর বইবে না। নদী ঠিক করল এই রাজ্যে আর জল বয়ে আনবে না। মেঘ ঠিক করল, আর কখনো বৃষ্টি ঝরাবে না। সবাই একসাথে বিদ্রোহ করল।

ফলে যা হওয়ার তাই হলো। রাজ্যের সবকিছু থেমে গেল। রাজার প্রজারা না দেখতে পায় সূর্যের আলো, না দেখতে পায় চাঁদের আলো। নদীর পানি শুকিয়ে যাওয়ায় রাজ্যে পানির সমস্যা দেখা দিল। ক্ষেতের ফসল নষ্ট হতে লাগল।

রাজ্যের সব প্রজা ছুটল রাজার কাছে। রাজাকে বলল, রাজা মশাই। এই বিচার বন্ধ করতে হবে। এই নির্দোষ শিশুদের ছেড়ে দিন। আমাদের সবাইকে আমাদের নিজ নিজ কাজ করতে দিতে হবে। আমরা আছি বলেই তো আপনি রাজা।

রাজা বুঝতে পারলেন আসলেও তাই। সবাই তাঁকে রাজা মানে বলেই তিনি রাজা। তাই তাদের কথাও তাকে শুনতে হবে। রাজা বন্দি শিশুদের ছেড়ে দিলেন। শিশুরা হাসতে হাসতে তাদের মায়েদের কাছে ছুটে গেল। পাখিরা আনন্দে গান ধরল। পাখির পাখার হাওয়া লেগে ফুলেরা কেঁপে উঠল। নদী কুলকুল বেগে বইতে লাগল। রাজাও পেলেন স্বস্তি। রাজা বুঝতে পারলেন, সবার আনন্দেই তাঁর আনন্দ। তিনি যে এতদিন নিজেকেই নিজে সাজা দিয়েছিলেন। আজ সবার আনন্দে তিনি পেলেন মুক্তির আনন্দ।

আজব রাজা

মুহম্মদ আহনাফ সিদ্দিক

এক ছিল এক আজব রাজা
থাকতেন আজব দেশে।
রাজপ্রাসাদে থাকত প্রজা
থাকত জাহাজ ভেসে।
রাজার জাহাজ ভাসছে এখন
নীল সাগরের পাড়ে।
রাজার যত জাহাজ ছিল
ডাকাত নিল কেড়ে।
ডাকাত ধরার আগে প্রজা
বলল কিছু গল্প,
গল্পে তাদের রাজার কথাই
গল্প ছিল অল্প।

দ্বিতীয় শ্রেণি, গলাচিপা মডেল সরকারি, প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী।

রাজা ও রানি

মো. মুশফিক মিদুল

এক যে ছিল রাজা
তার ছিল দুই রানি
বড়ো ছিল দুয়োরানি
ছোটো ছিল শুয়োরানি।
ভালো থাকার বেশির আশায়
বড়ো রানি বলল
শোনেন আমার রাজা মশাই
শুয়ো রানির বাবা মস্ত কসাই।
রাজা বলল, বলো কি?
রানি বলল আমি নিজে দেখেছি
চার হাত পা ধরে দিচ্ছে জবাই করে।
এবার রাজা মুকুট ধরে
কাঁপছে ভয়ে থরে থরে
হঠাৎ রাজা দৌড় মেরে
উঠল ছোটো রানির ঘরে।
বড়ো রানি দেখল চেয়ে
চোখের পানি পড়ছে বেয়ে
একি করলাম হায়
মিছা গল্পে মনের রাজ্যে
হয়-না কভু জয়।

ষষ্ঠ শ্রেণি, মহানগর আইডিয়াল স্কুল, ঢাকা।

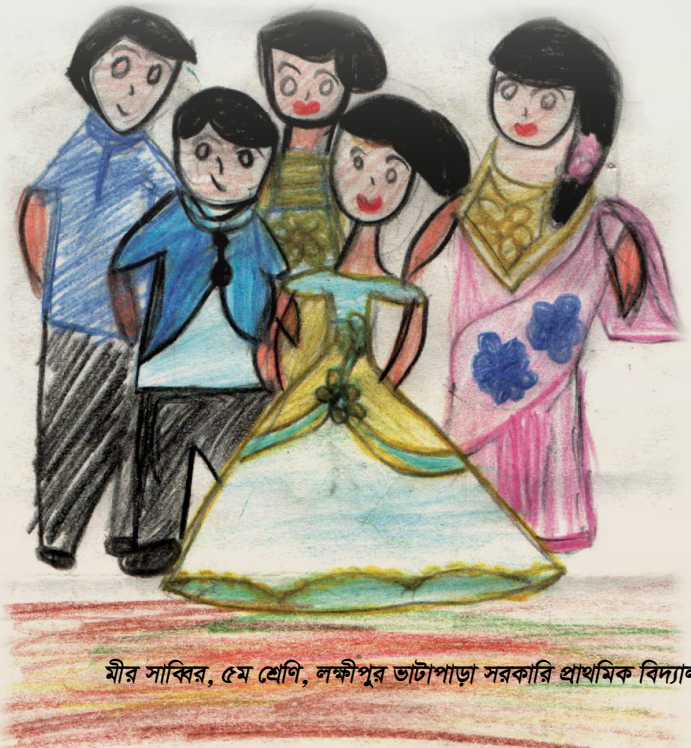

মীর সাব্বির, ৫ম শ্রেণি, লক্ষীপুর ভাটাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

কে হবে রাজা

নাসিম সুলতানা

চৈনিক শাসনামলে চীন দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি খুব দয়ালু ও সুশাসক ছিলেন। রাজ্যের সবাই অনেক সুখেশান্তিতে এবং নিশ্চিন্তে দিন যাপন করছিলেন। রাজ্যে সহসা কেউ অন্যায় করলে তখনই রাজার কাছে নালিশ চলে যেত।

রাজা কখনো শাস্তি দিতেন আবার কখনো সিংহাসন থেকে নেমে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ভালো করে বুঝিয়ে দিতেন।

গরিব লোকদের সাথে রাজার সম্পর্ক ছিল বন্ধুর মতো। তাদের কাছে চাষাবাদের খোঁজখবরও নিতেন। দরকার মতো টাকাপয়সা দিয়ে তাদেরকে চাষাবাদের কাজে সহযোগিতাও করতেন। যে যেভাবে পারত রাজাকে খাজনা দিত। কেউ খাজনা দিতে না পারলে তা পরের বছর পরিশোধ করার নিয়ম ছিল।

রাজ্যের ধনী-গরিব সবাই রাজার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট ছিল। এভাবে তাদের দিন ভালোই কাটছিল। রাজ্যের লোক বহুদিন সুখে শান্তিতে বসবাস করে আসছে। হঠাৎ তাদের ভাগ্যে বিপর্যয় নেমে আসলো। কারণ রাজা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। অবশ্য রাজার বয়সও হয়েছে। ভালো ভালো ডাক্তার, কবিরাজ সকলেই তার চিকিৎসার কোনো ত্রুটিই করল না, কিন্তু রাজা আর সুস্থ হলেন না। আস্তে আস্তে তিনি আরো দুর্বল হয়ে পড়েন। অসুস্থতার কারণে তিনি ঠিকমতো রাজ্য পরিচালনা করতে পারছেন না। কেমন যেন চারদিক এলোমেলো হয়ে গেল। এ অবস্থায় কে রাজ্য

পরিচালনা করবে? এ চিন্তা সকলের মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে।

রাজার প্রধান সেনাপতি চায় সেই- ই রাজা হবে। উজির- নাজির তাদের মনেও ঐ এক কথা। অর্থ মন্ত্রীতো বলেই ফেললেন- আমাকে যদি দায়িত্ব দেওয়া হয় তো আমি অবশ্যই রাজ্য ঠিকমতোই পরিচালনা করতে পারব।

অসুস্থ রাজা অনেক ভেবেচিন্তে জনসভা ডাকলেন। রাজসভায় সবাই বিমর্ষ হয়ে বসে আছেন। কারো মুখে কোনো কথা নেই। গরিব জনগণদের মধ্যে থেকে লুসাং নামের এক কিশোর বালক উঠে দাঁড়িয়ে রাজাকে কুর্নিশ জানিয়ে কিছু বলবে বলে অনুমতি চাইল।

রাজা বালকের কথায় অবাক হয়ে ভাবছে এত ছোটো ছেলে- সে আবার কী বলতে চায়। দেখাই যাক না কী বলে? তিনি অনুমতি দিলেন।

ছেলেটি রাজার নিকট বসা কিশোর যুবরাজ চিংসাঙকে দেখিয়ে বলল, তাকে ভবিষ্যৎ রাজা করার জন্য। সে আরো বলল- আমি তো ওর সমান। আমি লেখাপড়া করি, ক্ষেতে কাজ করি, বাবা- মা ও ছোটো ভাই-বোনদের দেখাশুনা করি। তো যুবরাজ চিংসাঙ পারবে না কেন?

এ কথা শুনে প্রজাগণ সকলেই উঠে দাঁড়ালো এবং একবাক্যে বলা শুরু করল ইউরেকা, ইউরেকা। চিংসাঙ, চিংসাঙ আমাদের রাজা— আমাদের রাজা।

রাজা প্রজাদের আর থামাতেই পারছেন না। তখন রাজা হাত উঁচু করে প্রজাদের উদ্দেশে বললেন- আমার পুত্র অনেক ছোটো- সে কীভাবে রাজ্য পরিচালনা করবে?

প্রজারা রাজার কোনো কথাই মানল না। উজির নাজির, প্রধান সেনাপতিসহ সবাই বলল যুবরাজ রাজা হবে- আমরা তাকে সহযোগিতা করব।

রাজা কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। তারপর পুত্রকে বললেন- বাবা চিংসাঙ, প্রজাদের কথামতো তোমাকেই রাজা হিসেবে ঘোষণা করছি— বলে পুত্রকে বুকে টেনে নিলেন এবং বললেন— একটা কথা মনে রাখবে। রাজ্য চালাতে গেলে সততা, বিশ্বাস, কর্তব্যপরায়ণতা, নিয়মানুবর্তিতা, সহনশীলতা, ন্যায়বিচার এবং জনগণের উপকারে নিবেদিতভাবে কাজ করলে তুমি একজন সত্যিকার ভালো শাসক হতে পারবে।

রাজা-রানি

মো. সিয়াম হোসেন

রাজা রানির গল্প
আছে জগৎ জুড়ে
ছোটো-বড়ো সবাই মিলে
পড়ে মজা করে ।

ভালো রাজার সাথে আছে
মন্দ রাজার কথা
ইতিহাসে পাওয়া যায়
তাদের নিয়ে নানা রূপকথা।

৮ম শ্রেণি, কমলাপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

রাজা ও রানি

রিপা তাসফিয়া নিশি

দাদা বলে পরির গল্প
দাদি বলে রাজা-রানি
দু'জনার কাছ থেকে
অনেক মজার গল্প শুনি।

শুনতে শুনতে ঘুমের রাজ্যে
যাই যে আমি হারিয়ে
ঘুমের ঘরে রাজা-রানি
ডাকছে হাত বাড়িয়ে।

দশম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর ল্যাবরেটরি স্কুল, ঢাকা।

বিচিত্র রাজা-রানি

মেজবাউল হক

আগবুলি আগবো ডেজলানি: ১৯৮৯ সালে ডেজলানি বেনিনের আবুমি প্রদেশের রাজা হিসেবে অধিষ্ঠিত হয়। এর আগে তিনি স্থানীয় পুলিশ বিভাগে চাকরি করতেন। এ রাজা নাকে একটি রুপার তৈরি ধূলি নিবারক পরে থাকতেন। যাতে রাজকীয় বাহিনী কুচকাওয়াজের সময় তার নাকে ধূলা ঢুকতে না পারে।

কামজা জোশেপ: ক্যামেরুনের বানদজুন রাজ্যের রাজা তিনি। রাজা হওয়ার আগে তিনি ক্যামেরুনের অর্থ মন্ত্রালয়ের মন্ত্রী ছিলেন। তার ছিল অশরীরী ক্ষমতা, যা দিয়ে তিনি জীবজন্তু পরিচালনা করতে পারতেন। ৯ সপ্তাহ ধরে প্রশিক্ষণ নিয়ে রাজা হয়ে ছিলেন তিনি।

তৃতীয় নিয়ামি কক মাবিনটস: কঙ্গোর কুবা রাজ্যের রাজা তৃতীয় নিয়ামি কক মাবিনটস। এ রাজার রাজকীয় পোশাকের ওজন ছিল ৮৫ কেজি। দুইদিন ধরে নানা আনুষ্ঠানিকতার পর রাজাকে এই পোশাক পরাতে সময় লাগে দুই ঘণ্টা। এই রাজার প্রজাদের বিশ্বাস ছিল তাদের রাজার অলৌকিক ক্ষমতা আছে।

আলহাজ মামাদু কবির উসমান: তিনি হলেন নাইজেরিয়ার কাতসিনার আমির। তিনি পোলো খেলার ভীষণ ভক্ত ছিলেন। আগেরদিনে কাতসিনার আমিরদের কোনো শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে রাজ্যের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ নতুন রাজা নির্বাচিত করত এবং তাকে কালো ষাঁড়ের রক্ত দ্বারা গোসল করাতেন। শুধু তাই নয়, সাবেক রাজাকে মেরে ওই ষাঁড়ের চামড়া দিয়ে মুড়ে পুঁতে ফেলত।

জুলু রাজাঃ আফ্রিকান গোষ্ঠীদের মধ্যে জুলুরাই সবচেয়ে বিখ্যাত। যোদ্ধা হিসেবে রয়েছে তাদের

বিশেষ খ্যাতি। জুলুদের বর্তমান রাজার নাম গুডউইল জুয়েল। এই রাজা বেশ বিলাসী। রয়েছে মার্সিডিস গাড়ি। এছাড়াও তিনি সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রিধারী। জুলুদের বাস সাউথ আফ্রিকাতে।

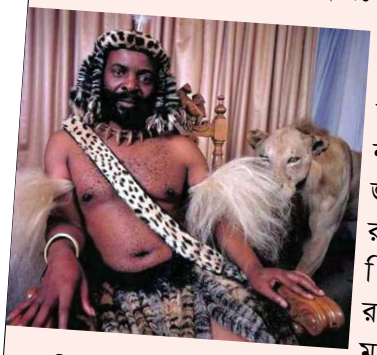

রানী পঞ্চম মডজাজিঃ এবার জানাব একজন রানীকে নিয়ে। তার নাম মডজাজি। দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবাস করত এই রানি। বৃষ্টির রানি ছিল তার উপাধি। তার প্রজাদের বিশ্বাস ছিল বৃষ্টির ওপর তার সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। তিনি ডাইনি বা জাদুবিদ্যার অধিকারী বলেও বিশ্বাস করা হতো। তার ছিল ৩৩ জন সহচরী।

ওবা জোশেপ এডকোলাঃ তিনি নাইজেরিয়ার আউ রাজ্যের রাজা। তার সাজসজ্জা দেখার মতো বটে। চোখে পড়া থাকে খাঁটি সোনার তৈরি চশমা, যা আকানদের ট্র্যাডিশনাল অনুষ্ঠান চলাকালে তাকে পরতে হয়।

জিমি মক্লনঃ এই রাজার বাড়ি ঘানাতে। ক্যামব্রিজের সাবেক ছাত্র এই রাজা বেশ ভালো ফুটবলার ছিলেন।

তিনি অবশ্য উত্তরাধিকার সূত্রে রাজা নন। ঘানার সরকার তাকে ১৯৬৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর নানা কফি অবনায়া রাজ্যের রাজা হিসেবে নিযুক্ত করে।

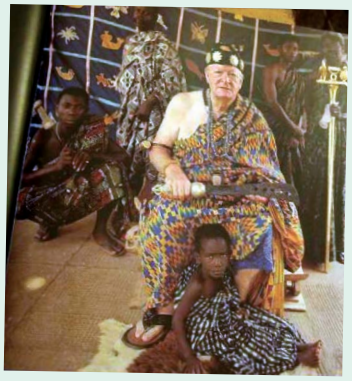

জোশেপ ল্যাংগানফিনঃ বেনিনে সরকারিভাবে কোনো রাজা নেই। জোশেপ মূলত আবুমির রয়েল

ফ্যামিলিস কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট। তার দাদা এই রাজ্যের রাজা ছিলেন। সেই সুবাদে তিনিও নিজেকে রাজা বলে ঘোষণা দেন। মূলত তিনি আবুমি রাজপরিবারের প্রতিনিধি হিসেবেই বিবেচিত।

রাজপ্রাসাদের কথা

রাজপ্রাসাদে রাজা থাকেন, তাই তো রাজপ্রাসাদ হবে দৃষ্টিনন্দন এটাই স্বাভাবিক। বর্তমান যুগে রাজা না থাকলেও তাদের ব্যবহৃত প্রাসাদগুলো আজও আমাদের আকর্ষণ করে প্রবলভাবে। বিশ্বে অনেক রাজপ্রাসাদ আছে এর মধ্যে কিছু কিছু তোমাদের জন্য তুলে ধরলাম–

ব্রিটিশ রাজপ্রাসাদ

ব্রিটেনের রাজাপ্রাসাদকে বলা হয় 'বাকিংহাম প্যালেস'। ১৯ শতকে এটি তৈরি করা হয়। রানি ভিক্টোরিয়া ছিলেন প্রথম রানি, যিনি এই প্রাসাদে থাকা শুরু করেছিলেন। এই প্রাসাদটি ৮,২৮,৮১৮ স্কয়ার ফুট। এ প্রাসাদের প্রবেশ পথ দুটি। আছে ৯৯ টি স্টেট রুম, শয়ন কক্ষ ৫২টি, আছে ১৮৮টি কর্মচারী শয়ন কক্ষ এবং ৯২টি অফিসসহ আরো অনেক কিছু।

সুলতানের প্রাসাদ

পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর প্রাসাদটি তৈরি করেছেন ব্রুনেইয়ের সুলতান। এই প্রাসাদটি তৈরি করতে সময় নেওয়া হয়েছিল দুই বছর। ১৯৮৪ সালে নির্মিত এই প্রাসাদে ১ হাজার ৭৭৮টি কামরা আছে। এই প্রাসাদটি নির্মাণে খরচ হয়েছে ২ হাজার ২০০ কোটি টাকার মতো।

কাঠের প্রাসাদ

জাপানের বর্তমান রাজধানীর নাম টোকিও। কিন্তু ১৮৬৮ সাল জাপানের রাজধানী ছিল কোয়াটা। ১৭শ

শতকে সেই সময়ের সম্রাট কোয়েটাতে একটি কাঠের প্রাসাদ নির্মাণ করেন। 'কাটাসুরা' নামের কাঠের এই প্রাসাদটি আজও টিকে আছে।

জারের প্রাসাদ

রাশিয়ার শাসককে বলা হতো জার (Tsar)। জার পিটার দ্য গ্রেট একটি প্রাসাদ তৈরির করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কাজ শুরু করলেও শেষ করে যেতে পারেননি। তার কন্যা ক্যাথেরিন ১৭৬২ সালে এটি নির্মাণ শেষ করেন। এই প্রাসাদে ১ হাজার ৫০০টি কামরা আছে। ১৯১৭ সালের গণঅভ্যুত্থানের আগ পর্যন্ত এটিই ছিল রাশিয়ান জারদের আবাসস্থল।

মিলিটারি হেডকোয়ার্টারস প্রাসাদ

১২৪৮ থেকে ১৩৫৪ সালের মধ্যে স্পেনের গ্রানাডাতে মুসলিম শাসকরা একটি প্রাসাদ তৈরি করেছিলেন।

'দ্য আলহামব্রা' বা লাল প্রাসাদ নামের এই প্রাসাদটি একই সঙ্গে মিলিটারি হেডকোয়ার্টারস হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। আর এখান থেকেই রাজ্য পরিচালনা করতেন সেই সময়ের রাজারা।

কিংবদন্তি প্রাসাদ

প্রায় ৪ হাজার বছর আগের কথা। গ্রিসের ক্রিট দ্বীপে বাস করতেন কিংবদন্তি রাজা মিনাস। জনশ্রুতি আছে, রাজা মিনাস 'মিনোটার' নাম একটি অদ্ভুত প্রাণী পালতেন। এই মিনোটারের অর্ধেক শরীর ছিল মানুষের আর বাকি অর্ধেক ছিল ষাঁড়ের। বর্তমানে এটি পর্যটকদের জন্য জাদুঘর হিসেবে সংরক্ষিত আছে। তোমরা যদি কখনো গ্রিসে যাও তাহলে দেখতে পাবে সেই সময়ের কিছু অয়েল পেইন্টিং (তৈলচিত্র)। আর এই অয়েল পেইন্টিংয়ে দেখা পাবে কিংবদন্তি প্রাণী মিনোটারের।

সংগ্রাহক : ফারিন আহমেদ

খুদে রাজারা

সাদিয়া ইফফাত আঁখি

তিন বছর বয়সে রাজা

অল্প বয়সে তো রাজা-রানি কেবল আগের দিনেই হতো। এখন কী আর হয়? এমন প্রশ্ন তোমার মনে থাকতে পারে বন্ধুরা। হ্যাঁ, সত্যিই আছেন অল্প বয়সি রাজা। তাও মাত্র ৩ বছর বয়সে রাজা হন তিনি। আফ্রিকার দেশ উগান্ডার টরো রাজ্যের রাজা। নাম চতুর্থ ওয়ো নিমবা কাবামবা ইগুরা রুকিদি (২৬) দেখতে আর দশটা সাধারণ কৃষ্ণাঙ্গ কিশোরের মতোই। রাজাদের মতোই তার প্রাসাদ আছে, মন্ত্রিসভা আছে, আছে সেনা-সামন্ত ও দুর্গ। তার রাজ্যের নাম তোরো। প্রজার সংখ্যা ২০ লাখেরও বেশি। ১৯৯৫ সালে বাবার মৃত্যুর পর মাত্র ৩ বছর বয়সে তিনি রাজা হন। তখন তিনি নামেই রাজা ছিলেন। ২০১০ সালের ১৭ এপ্রিল তার ১৮ বছর পূর্ণ হয়। ঐ দিনই বিশাল অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশটির রাজা হয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ওয়ো।

জন্মের পরই রাজা

জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গেই রাজা হয়েছিলেন স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ অ্যালফনসো। তার জন্মের ছয় মাস আগেই মৃত্যু হয় রাজা অ্যালফনসো-এর। তাই জন্মানোর সাথে সাথেই তাকে রাজা ঘোষণা করা হয়। ১৯০২ সালে ১৬ বছর বয়সে পুরোপুরি রাজা হন ত্রয়োদশ অ্যালফনসো। এর আগ পর্যন্ত রানি মারিয়া ক্রিস্টিয়ানা পুঁচকে রাজার প্রতিনিধি ও অভিভাবক হিসেবে দেশ শাসন করেন।

খুদে সম্রাট

যদি বলি তোমার মতো বয়সি কেউ একজন সম্রাট হয়েছিলেন গোটা ভারতে, তাহলে নিশ্চয়ই খুব অবাক হবে। হ্যাঁ বন্ধুরা, সত্যিই। ১৫৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি ভারতের সম্রাট হন জালালুদ্দিন মুহম্মদ আকবর। সম্রাট আকবরের পুরো নাম এটা। বাবা সম্রাট হুমায়ুনের মৃত্যুর পর দিল্লির সিংহাসন খালি হয়ে যায়। তখন সম্রাটের ছেলে হিসেবে তাকেই সিংহাসনে বসতে হয়েছিল মাত্র ১৩ বছর বয়সে।

শিশু বাদশাহ

পারস্যে ছিলেন অনেক শিশু বাদশাহ। এদের মধ্যে দ্বিতীয় শাপুর নাম সবার আগেই আসে। ৩১০ সালে জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই বাদশাহ হিসেবে স্বীকৃতি পান তিনি। পরিণত বয়স হওয়া পর্যন্ত তার মা ইফ্রাই বাদশাহর অভিভাবক হিসেবে দেশ শাসন করেন।

আরো কিছু খুদে রাজা

১২৮৯ সালে ৩ বছর বয়সে দিল্লির সিংহাসনে বসেন রাজা কাইমুর্স। তবে পরের বছরই তাকে ক্ষমতা হারাতে হয়। আরো ছিলেন ৮ বছর বয়সে নিজাম শাহ, ৯ বছর বয়সে সামসুদ্দিন মুহম্মদ শাহও ১২ বছর বয়সে শেহাব উদ্দিন মাহমুদ শাহ্ দিল্লির সুলতান হন। শিশু বয়সে রাজা, সুলতান, সম্রাট যাই হোক না কেন মূলত শিশু শাসকদের তখন কোনো ক্ষমতা ছিল না। তাদের অভিভাবক হিসেবে রানিমা, সেনাপতি কিংবা কোনো প্রভাবশালী অমাত্য দেশ শাসন করতেন।

একটু ভেবো

গিয়াস উদ্দিন রূপম

তোমরা যখন অট্টালিকায়
থাকো ভীষণ স্বস্তিতে
তারা তখন উপোস পেটে
কাঁদছে বসে বস্তিতে।
সকাল- বিকাল তোমরা থাকো
নিত্য নতুন সাজ করে
তারা তখন উদোম গায়ে
অন্য বাসায় কাজ করে।
তোমরা যারা বসত করো
আকাশ ছোঁয়া আবাসে
একটু ভেবো তাদের কথা
দুঃখে যাদের গা ভাসে।

এই ছড়াটার নাম নেই

ফখরুল ইসলাম

এই ছড়াটা বানিয়ে সেদিন দেখি ছড়ায় খুঁত ছিল
যদিও গোপনে বলছি তবু ছড়ায় একটা ভূত ছিল
জ্বালার উপর জ্বালা হয়ে ভূতটা ভীষণ বদ ছিল
জন্ম নিয়েই সেই ছড়াটার
ঘাড়েতে বিপদ ছিল।
কী করে যে ভূতটা নামাই ঘামে কপাল ভিজ ছিল
ভীষণ রকম খাটাশ ভুতটা নাছোড়বান্দা চিজ ছিল
বলে সে কী এই ছড়াটায়
অনেক মজা পাচ্ছিল
ভালো লাগার এই ছড়াটা নেবে বলে চাচ্ছিল!
পাগল নাকি! ছড়াটা যে অনেক কষ্টের ফল ছিল
ভূতটা তবু ছড়া রেখে যাবে নাকো বলছিল
বললাম বাবা মাফ করে দে বলায় অনুনয় ছিল
মাফ করল তা- ঘটলো সেটাই যেটা ঘটার ভয় ছিল।
ছড়ার শিরোনামটা ভূতে নিয়েই পরে থামছিল
তোমরাই বলো ছড়াতে কি কোনো শিরোনাম ছিল?

টাকার মধ্যে এই ছবিটা কার?

শাহীন আলম

খোকা : আচ্ছা মাগো টাকার মধ্যে এই ছবিটা কার?
কোন্ সিনেমার নায়ক তিনি দেখতে চমৎকার !
মা: ওরে খোকা চিনিস না তুই ছবির মানুষটাকে?
লেখক কবি শিল্পীরা তার কত্ত ছবি আঁকে!
অভিনেতা নন তিনি ছিলেন নেতা,
তাঁর কারণেই একাত্তরে যুদ্ধে হলো জেতা।
নায়ক তিনি রাষ্ট্রনায়ক শোষিতদের মিতা,
তিনি হলেন বঙ্গবন্ধু তিনি জাতির পিতা।
খোকা: তাই নাকি মা? যোদ্ধা তিনি? করেছিলেন লড়াই?
তাঁকে নিয়ে তাই তোমাদের গৌরব আর বড়াই?
মাগো তোমার বঙ্গবন্ধু কোথায় থাকেন বলো,
সামনা সামনি দেখব তাঁকে আমায় নিয়ে চলো।
মা: বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের সকল খানেই থাকেন,
আদর করে বাংলাদেশকে বুকের মধ্যে রাখেন
জন্মেছিলেন গোপালগঞ্জে, টুঙ্গিপাড়া গ্রামে
নিত্য চিঠি লিখেন তিনি লাল সবুজের খামে।
খোকা: আমিও চিঠি লিখবো তাকে কোথায় পাব খাম?
ঠিকানাটা দাও লিখে দাও, দাও লিখে তার নাম।
মা: নাম হলো তার শেখ মুজিবুর শুনতে লাগে বেশ
শেখ মুজিবের নামের পাশে লিখবি বাংলাদেশ।
খোকা: তাতেই চিঠি পৌঁছে যাবে জাতির পিতার কাছে?
মা: পৃথিবীতে এমন নায়ক আর কি কেউ আছে?
খোকা: বাংলাদেশের নামের পাশে শেখ মুজিবের নাম
লিখে রাখলাম মাগো আমি এই লিখে রাখলাম।

বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ

মাহিম আসাদ

সবুজ শ্যামল বাংলাদেশ
শান্তির দেশ, উন্নয়নের দেশ
জঙ্গিমুক্ত সারা দেশ
বঙ্গবন্ধুর বাংলাদেশ।

তৃতীয় শ্রেণি, শের-ই-বাংলা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মধুবাগ, মগবাজার, ঢাকা।

আমার প্রিয় মা-বাবা

ইলা ইয়াসমিন

পৃথিবীতে অমূল্য সম্পদ মা-বাবা
মা-বাবার স্নেহ মায়ায় ভরা,
এই আমাদের পৃথিবী।
পৃথিবীতে যার কোনো সম্পদ নেই,
তার অমূল্য সম্পদ মা-বাবা।
যার পৃথিবীতে মা-বাবা নেই,
তার সম্পদ থেকেও সম্পদ নেই।
পৃথিবীতে সবচেয়ে আপন মানুষ
মা-বাবা।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, লক্ষীপুর ভাটাপাড়া, রাজপাড়া, রাজশাহী

হাটটিমা টিম টিম

বাহারুল হক লিটন

হাটটিমা টিম টিম
কোন মাঠে যে থাকে ওরা
কোথায় পাড়ে ডিম ?
তাদের শিং দু'টি খুব খাড়া
দেখলে মানুষ লেজ উঁচিয়ে
করে ভীষণ তাড়া ?
হাটটিমা টিম টিম
খুঁজতে গিয়ে রক্ত গায়ের
সব হয়ে যায় হিম ?
ভয় পেয়ো না খোকন সোনা
হাটটিমা টিম টিম
ওরা থাকে বইয়ের পাতায়
খাতায় পাড়ে ডিম।
ওরা হাটটিমা টিম টিম।

ভালো লাগে

রকিবুল ইসলাম

ভালো লাগে পড়তে
লেখালেখি করতে
ভালো লাগে দলবেঁধে ছুটতে
ঝরা আম খুটতে।
ভালো লাগে হাসতে
খুব ভালোবাসতে
ভালো লাগে মাছ হয়ে ভাসতে
দাওয়াতের গাস্‌তে।
ভালো লাগে উড়তে
প্রজাপতি ধরতে
ভালো লাগে মেঘ হয়ে ঘুরতে
বারি হয়ে ঝরতে।

আজগুবি শখ

সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

হাঁচি দেয় কাশি দেয়
দেয় হাবু খুব
রোদে পুড়ে ঘামে ভিজে
দেয় জলে ডুব।
তেল মাখে দেহে সুখে
আজগুবি শখ
সারাদিন পথে ঘুরে
খায় ঝাল টক।
ঢং সেজে রং মেখে
চলে কি যে সুখে
পাড়া জুড়ে পড়ে সাড়া
থাকে হাসি মুখে।
নেই ভাবনা যে নেই
এই বেশে রয়
পড়া নেই কাজ নেই
নেই মনে ভয়।

কবিতা আমার সুখ

মুস্তফা হাবীব

যারা স্বপ্নীল খাঁটি সোনা
আছে বাংলার বনে,
বলবো আমি তাদের কথা
শুভ্র সাদা মনে।

রবি ঠাকুর, কাজী নজরুল
কালের শ্রেষ্ঠ দান,
নরসিংদীর ক্ষণজন্মা
শামসুর রাহমান।

বরিশালে জীবনানন্দ
এবং আবুল হাসান,
ফরিদপুরে জসীম এবং
সুকান্ত দেয় ভাসান।

কুমিল্লাতে আল মাহমুদ
মোংলায় রুদ্র সেরা,
বরিশালেই গড়ছি আমি
কবিতার এক ডেরা।

সৈয়দ আলী, ফররুখ এবং
মাইকেল আছে মনে,
সুফিয়া কামাল একজনই
উড়ছে সমীরণে।

রফিক এবং হেলাল হাফিজ
আমার প্রিয় মুখ,
কবিতা আমার ধ্যান খেয়াল
কবিতায় আমার সুখ।

সাদিয়া হোসেন মিম, চতুর্থ শ্রেণি, এভার গ্রীন ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, গুলশান-১, ঢাকা

প্রিয় দেশ

আরিফা আক্তার

সবুজে ঘেরা দেশটি
নাই তো রূপের শেষ
সে যে আমার মাতৃভূমি
আমার বাংলাদেশ।

এই দেশে জন্মেছি বলে
জীবন আমার ধন্য
মিলেমিশে বাস করে সবাই
নেই জাতি ভেদাভেদ, ধর্ম, বর্ণ।

৮ম শ্রেণি, মতিঝিল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

জ্যৈষ্ঠ মানে

মোহাম্মদ নূর আলম গন্ধী

জ্যৈষ্ঠ মানে মধু ফলে
রঙিন করা মুখ
হরেক রকম ফলের স্বাদ
তৃপ্তি ও সুখ।

জ্যৈষ্ঠ মানে বাতাসে আজ
পাকা ফলের ঘ্রাণ
মজা করে খায় সবে
জুড়ায় দেহ প্রাণ।

জ্যৈষ্ঠ মানে হৈ চৈ
ফল কুড়ানোর ধুম
দস্যি ছেলে ছুটছে ওই
নেইকো তার ঘুম।

জ্যৈষ্ঠ মানে বাধা নিষেধ
ভেঙে ফেলার দিন
উল্লাসে তাই মনটা নাচে
তা ধিন তা ধিন।

শেষ কথা

মাকিদ হায়দার

দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। তিন দিকে সবুজ ধানের ক্ষেত, পাটের ক্ষেত এমনকি যোগেশ ঘোষের বিশাল আমবাগান, আমবাগানের দক্ষিণেই ঘোষদের গরুর বাথান, বাথানে একশটি গরু হবার আগেই একটি দুধেল গরু প্রতি বারই মারা যায়, যখন আর একটি গরু নতুন একটি বাছুরের জন্ম দেয়, ঘটনাটি সেই দিনই। দুধেল গরুটি মারা যাবার খবরটি যেন বাতাসেই ছড়িয়ে পড়ে ঘোষপাড়ার ভেতর। শুধু যে ঘোষপাড়ার ভেতর কথাটি সীমাবদ্ধ থাকে তা নয় বেড়াবাজারের দুধের আড়তে এবং বেশ কয়েক মাইল পশ্চিমের বাঘাবাড়ি, উত্তরের কাশিনাথপুরে কথাটি চলে যায়। নগরবাড়ির লোকজনও জেনে যায়। যোগেশ ঘোষের দুধের একটি গরু মাত্র তিনবার লাফ দেবার পরেই মারা গিয়েছে, বেড়ার বিপিন বিহারী হাই স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্র আমাদের সহপাঠী গোপাল ঘোষই জানিয়ে দিলেন তাদের একটি গরু মারা গিয়াছে নতুন একটি বাছুর হবার পরে।

দিগন্তবিস্তৃত সেই মাঠের পূর্ব দিকেই যমুনা নদী, নদীর ওপাড়েই চর নাকালিয়া রইচর বাউশিয়া চৈত্র-বৈশাখের ধু-ধু বালি। সেই বালির দিগন্ত পেরিয়ে আমরা জনদশেক যমুনার পূর্ব দিকেই কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থাকি চৈত্র-বৈশাখের প্রচণ্ড রোদের তাপ মাথায় নিয়ে দেখতে থাকি একটি দুটি বড়ো বড়ো গহনার নৌকা। নৌকায় পাট বোঝাই করে বেড়াবাজারের ইংরেজ সাহেবদের র‍্যালি ব্রাদার্সের পাটের গুদাম থেকে ঐ পাট বোঝাই নৌকাগুলো রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে উত্তরের নগরবাড়ি। গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে। মাঝে মাঝে ঝড় বৃষ্টির লক্ষণ দেখলে মাঝিদের নৌকাতেই রাত্রিযাপন করতে হয়। গহনার নৌকায় হয়ত তক্ষুনি কথার ছলে মাঝিমাল্লারাই জানিয়ে দেয়, যোগেশ ঘোষের গরু মারা যাবার খবরটি।

আমরা জনদশেক ছাত্র নাকালিয়া বাউশিয়া থেকে প্রতিদিন ওপাড়ের বেড়ার বিপিন বিহারী হাই স্কুলে যে নিয়মিত যাই না, সেকথা আমাদের বাবা-মা সবাই জানেন। চৈত্র বৈশাখের গরমে একটি মাত্র ছাতা হাতে নিয়ে শুধু বুলবুলের বাবা প্রায় প্রতিদিনই এগিয়ে দিয়ে যায় নদীর ঘাটে। যতক্ষণ পর্যন্ত সুবল মাঝি না আসে, ততক্ষণই বুলবুলের বাবা ছেলের মাথার উপর ছাতা ধরে রাখেন যেন রোদ না লাগে। শুধু বর্ষার সময়

আমাদের সকলেরই ভীষণ সুবিধা, সুবল মাঝি তার নৌকা নিয়ে ঘরের দরজার কাছে থেকেই নাকালিয়া বাউশিয়া থেকে পশ্চিমের বেড়াঘাটের দিকে অন্য দু-চারজনকেও পারাপার করতে হয়। তাদের কাজকর্ম থাকে। তবে বেড়া বাজারে নিয়মিত আসেন ধীরেন কাকা, মনসুর চাচা, উনারা দু'জনেই চাকরি করেন র‍্যালি ব্রাদার্সের জুটবেলিং কোম্পানিতে; এছাড়াও দুই চারজন বেড়া বাজারে।

ধীরেন কাকা মাঝে মাঝে গল্প করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে তখন তার বয়স দশ কী এগারো, সেই বছরে নাকি চর এলাকায় অনেক লোক কলকাতা থেকে পালিয়ে এসে উঠেছিল আমাদের বাউশিয়ায়। শুধু বাউশিয়ায়ই নয়, বেড়ায়, এমনকি সারা দেশেই নাকি দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছিল ব্রিটিশদের কারসাজিতে। সেই দুর্ভিক্ষে নাকি হাজার হাজার মানুষ কলকাতা ফুটপাতে মারা গিয়েছিল না খেয়ে। ধীরেন কাকাকে কথার মাঝখানে বুলবুল আহমেদ থামিয়ে দিয়ে সেদিন জানতে চেয়েছিল- কাকা, ফুটপাত কাকে বলে? বুলবুলের কথায় মনসুর চাচা হেসে দিয়ে বলেছিল যদি কোনোদিন ঢাকায় কিংবা নারায়ণগঞ্জে বেড়াতে যাস, সেখানেই দেখবি বিশাল বিশাল রাস্তার পাশে পায়ে চলার জন্য ছোটো ছোটো রাস্তা আছে। সেই রাস্তাগুলোর নাম ফুটপাত।

আমাদের সহপাঠী ইয়াকুব জানতে চাইল বড়ো বড়ো রাস্তা দিয়ে কী মানুষ যাতায়াত করে না?

ইয়াকুবের প্রশ্নের উত্তর দিল আমাদেরই গফুর ভাই। তিনি জানালেন, বড়ো রাস্তা দিয়ে শুধু মোটরগাড়ি, বাস, ট্রাক চলাচল করে। তাই সাধারণ মানুষেরা রাস্তার মাঝখান দিয়ে যেন না যায়, সেই জন্যেই রাস্তার দুই পাশ দিয়ে যে ছোটো রাস্তা, সেটির নাম ফুটপাত। পায়ে চলার পথ। সেই ফুটপাতেই নাকি হাজার হাজার লোক না খেয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায় মারা গিয়েছিল জানালেন গফুর ভাই। যেমনটি জানাতে চেয়েছিলেন ধীরেন কাকা।

সেদিন স্কুল ছুটি শেষে আমরা সকালে যখন হইহই করতে করতে সুবল কাকার নৌকায় উঠলাম তখন নসুর চাচা বুলবুলকেই জিজ্ঞাসা করলেন। তোরা সকলে কী একই ক্লাসের?

আমি জানিয়ে দিলাম, বুলবুল, আমি, ইয়াকুব, ইলিয়াস আর হরিপদ ক্লাস টেনে। আনিস, কৃষ্ণ, কানাই, ওরা ক্লাস এইটে। শুধু ভুদেব আর জাহিদ ক্লাস নাইনে।

গফুর ভাই এদিক-সেদিক তাকিয়ে বললেন ভুদেবকে দেখছিনা আজ কয়েক দিন। ভুদেব নাকি ছাত্র খুব ভালো। ও নাকি ক্লাস এইটে উঠেছিল। সে কথার উত্তর কানাই দিয়ে জানাল ভুদেব গিয়েছে সুজানগরের পদ্মা নদীতে ওর বাবার সঙ্গে ইলিশ ধরতে। এক্ষুণি ইলিশ ধরার সময়। ভুদেবের জামাই বাবুর বাড়ি নগরে। জামাই বাবু দিন কয়েক আগে এসেছিলেন আমাদের বাউশিয়ায়, দিদিকে সাথে নিয়ে। জামাইবাবু, তুলসী কাকা আর ভুদেবকে সঙ্গে নিয়ে গেছেন তার নিজের নৌকায়। আমাদের নাকালিয়া, বাউশিয়া থেকে নগরবাড়ি যেতে খুব সময় লাগে না, ঘণ্টা তিনেক নাকি লাগে। ভাটির দিকে যেতে মজা। ভরা বর্ষাকালে তরতর করে পালে বাতাস লাগিয়ে, সবাইকে থামিয়ে দিল আনিস যেদিন পালে বাতাস লাগে না সেদিন?

আনিসের সে কথার উত্তর দিল হরিপদ দাঁড় টানতে

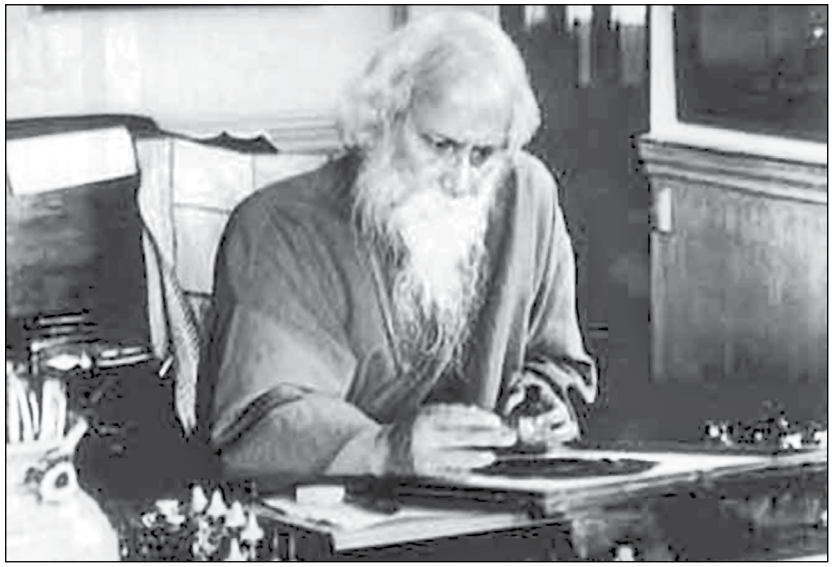

হয় কেন? তোর মনে নেই রবীন্দ্রনাথের সেই দুটি গল্পের রূপকথা; সম্পূর্ণ করতে দিল না, মনসুর চাচা বললেন, ছুটি এবং পোস্টমাস্টার গল্প রবিবাবু আমাদের শাহজাদপুরে উনার কাচারি বাড়িতে বসে লিখেছিলেন কৃষ্ণ এবং জাহিদ যেন একসঙ্গেই বলল চাচা, ঐ পোস্টমাস্টারের সাথে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় হয়েছিল। তিনিই নাকি অনুরোধ করেছিলেন তাকে নিয়ে গল্প লিখতে। তাই রবীন্দ্রনাথ শাহজাদপুরে বসে শুধু ঐ গল্পই লেখেননি তিনি কবিতাও লিখেছিলেন। বুলবুল জানাতেই র‍্যালি ব্রাদার্সের ছোটোবাবু ধীরেন কাকা বুলবুলের নিকট থেকে জানতে চাইল তুমি এত খবর জানলে কেমন করে? বুলবুল হেসে দিয়ে জানাল- আমার দাদা রবি ঠাকুরের ঐ কাচারি বাড়ির একজন ছোটো খাটো কর্মচারী ছিলেন। দাদা বাবাকে বলেছিলেন, আমাদের জমিদার বাবুর কাছে হিন্দু, মুসলমান, জেলে, কামার, কুমার, তাঁতি, চাষি, সব সমান। অনেকবার নাকি, অনেক প্রজার খাজনা মাফও করে দিয়েছিলেন, দেখতে নাকি তালগাছের মতো লম্বা ছিল। ঠিক তক্ষুণি আমরা আবার হেসে উঠতেই। গফুর ভাই জানালেন, রবিবাবুর একটি কবিতা আছে তালগাছ নামে। আমাদের সহপাঠী হরিপদ সাথে সাথে আবৃত্তি শুরু করতেই মনসুর চাচা জানতে চাইলেন জাহিদের নিকট থেকে, তোমাদের ক্লাসের ফার্স্ট বয় কে? কৃষ্ণ জানালেন- ভুদেব। তবে আমাদের স্কুলে সবচেয়ে গানের গলা ভালো বুলবুলের। ধীরেন কাকা বললেন, ভুদেব যদি ফার্স্ট বয় হয় তবে সেকেন্ড বয় কে? আমিই দেখিয়ে দিলাম বুলবুলকে এমন সময় সিরাজগঞ্জের দিক থেকে একটি লঞ্চ অনেক লোকজন নিয়ে বাঁশি বাজাতে বাজাতে ভিড়তে শুরু করল বেড়া ঘাটের দিকে। ধীরেন কাকা বললেন, এই বড়ো লঞ্চগুলো প্রতিদিন সকাল দশটায় এই ঘাটে আসে। লোক নামে, মালামাল নামে, উঠানো হয়, বেড়ার লুঙ্গি, শাড়ি, চাউলের বস্তা, কাঁচামরিচ। নগরবাড়ি ঘাট থেকে উঠবে এবং শাহাজাদপুরের শাড়ি, বাঘাবাড়ির ঘি, পটল। কাশীনাথপুর, মাসুন্দিয়ার মহাজনেরা ঐ সকল মালামাল নিয়ে পরদিন সকালে পৌঁছাবে ঢাকার সদর ঘাটে। কাকা বাবু কথা শেষ করে নিজের ঘড়ির দিকে তাকাতেই আমরা জনাকয়েক একসঙ্গেই জানতে চাইলাম কয়টা বাজে, ধীরেন কাকা তার ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বললেন, সকাল দশটা সাত মিনিট উনিশ সেকেন্ড। তখুনি মনসুর চাচা বললেন, ভালো লেখাপড়া শিখেই একদিন তোমরা গাড়িঘোড়া চড়তে পারবে। সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে তোমাদের নাম। প্রায় প্রতিদিনই পূর্বের নাকালিয়া থেকে পশ্চিমের বেড়াঘাটে আসত পড়ালেখার গল্প। এমনকি আফ্রিকা মহাদেশের কালো লোকদের প্রতি সাদা, ইংরেজরা কয়েকশত বছর যে ভাবে অত্যাচার করে চলেছে, সে সব গল্পও হয়। বিশেষত, নৌকাটি যখন আসে তখুনি লেখাপড়ার গল্পের পাশাপাশি ধর্মের গল্প বলেন মনসুর চাচা। নীলনদের ফেরাউনদের গল্পটা খুবই সাজিয়ে গুছিয়ে এমন ভাবে গফুর ভাই বলেন যেন তিনি সেই সময়ে ফেরাউনদের কাছাকাছি থাকতেন।

বুলবুল একদিন জানতে চাইল, সেই ফেরাউনদের আমলে রাজা বা রানি মারা গেলে ওদের নাকি মমি বানিয়ে রাখত, সেটা নাকি হাজার বছরেও পচেনি। মিশরের জাদুঘরে এখনো তাদের দেহ নাকি রেখে দিয়েছে মমি করে। এটি কী করে সম্ভব বুলবুলের কথার সঙ্গে ভুদেব বলল, এটা তো সম্ভব নয় ধীরেন কাকা দুজনকে থামিয়ে দিয়ে জানালো, তোরা নিশ্চয়ই জানিস, পৃথিবীতে মিশরীয়রাই প্রথম কাগজ আবিষ্কার করেছিল ওষুধ এবং জ্যোতির্বিদ্যায়, আরবীয়ও পূর্ব অনেক বৈজ্ঞানিকের জন্ম হয়েছিল। হয়ত সেই সকল বৈজ্ঞানিকদের কেউ এমন ওষুধ আবিষ্কার করেছিলেন, সেটি মৃত মানুষের দেহে মাখিয়ে দিলে সহজে সেই মানুষের দেহে পচন ধরবে না। আমার বড়ো দাদা তোদের বন্ধু অতিশের বাবা দুই বছর আগে কলকাতা থেকে এসে জানিয়েছিলেন— কলকাতার জাদুঘরে তিনি মমি দেখে এসেছেন। যাকে মমি বানানো হয়েছে তিনি না কি দশ বারো হাত লম্বা। বিশাল বিশাল পা।

এমন সময় নদীর ভেতরে একটি শিশু ভুশ করে মাথা দেখিয়ে যখন নদীর নীচে চলে গেল তখন দীনেশ কাকা বললেন- যমুনায় এবার অনেক শিশু এসেছে বোধহয় যমুনার মাছগুলো সব ওদের পেটেই যাবে। জেলেদের মাছ ধরা জালে মাঝেমধ্যে দুই একটি ধরাও পড়ে। পড়লেই সেটি আবার বেড়া বাজারের অসীম কবিরাজ কিনে নিয়ে নানা রোগের তেল বানিয়ে বিক্রি করে। বিশেষত হাটের দিন বাতের তেল বেশি বিক্রি হয়। আমার ছোটো কাকা সেদিন বললেন, অসীম কবিরাজের শিশুর তেল খুব উপকারী।

বেড়া ঘাটের কাছাকাছি আসতেই ধীরেন কাকা, গফুর ভাই আর মনসুর চাচাকে বললেন, আগামী মঙ্গলবারে

ছেলেদেরকে নিয়ে আমাদের বাড়িতে আসিস। আফ্রিকা মহাদেশের কালো মানুষদের ওপর ইংরেজদের নির্যাতনের ওপর একটি বই দাদা কলকাতা থেকে এনেছিলেন তখুনি মনসুর চাচা বললেন, কালকে বিকালে নাকি সুজন গরের পূর্বদিকে যমুনায় পাবনার এক জজ সাহেব পাখি শিকার করতে এসে ছড়ের নৌকা ডুবিতে মারা গিয়েছে। গতকাল রাতেই শুনলাম জজ সাহেব আর দাদা দুইজনেই যমুনায় তলিয়ে গেছে। ঝড়ে সেই নৌকাকে গোয়ালন্দ ঘাটের কাছে পাওয়া গিয়েছে। গফুর ভাই আরো জানালো, বাজারে গেলেই জানতে পারব। এমন সময় নৌকা ঘাটে ভিড়তেই বুলবুল আর আমি ধীরেন কাকাকে বললাম, আমাদেরকে আফ্রিকানদের গল্প শোনাতে হবে।

চৈত্র-বৈশাখের ধু-ধু বালি। সেই বালির দিগন্ত পেরিয়ে আমরা জনদশেক যমুনার পূর্ব দিকেই কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থাকি চৈত্র-বৈশাখের প্রচণ্ড রোদের তাপ মাথায় নিয়ে দেখতে থাকি একটি দুটি বড়ো বড়ো গহনার নৌকা। নৌকায় পাট বোঝাই করে বেড়াবাজারের ইংরেজ সাহেবদের র‍্যালি বাদ্রার্সের পাটের গুদাম থেকে ঐ পাট বোঝাই নৌকাগুলো রাজহাঁসের মতো ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে উত্তরের নগরবাড়ি। গোয়ালন্দ ঘাটের দিকে।

কাকা বললেন নিশ্চয়ই। নাকালিয়া আর বাউশিয়ায় আমরা বিভিন্ন বয়সের বিভিন্ন ক্লাসের ছেলেরা দলবেধে ধীরেন কাকার বাড়িতে সেদিন গেলাম। সেদিন সকালে খুব আগ্রহ নিয়ে শুনলাম আফ্রিকানদের ক্রীতদাস বানিয়ে ইংরেজরা অত্যাচার করে বিক্রি করে দিত ইউরোপের বিভিন্ন দেশে এবং কথা না শুনলে বাড়ির কুকুর দিয়ে খাইয়ে দিত। সহজ সরল জীবন যাপনের সেই কালো মানুষের দেশে পাওয়া যেত খনিজ সম্পদ- হীরা, সোনা, কয়লা,অনেক কিছু। সব কিছু নিয়ে যেত ইংরেজরা তাদের দেশে ইউরোপে। ধীরেন কাকার কথার মাঝখানে ইয়াকুব বললেন, বুঝতে পেরেছি পশ্চিম পাকিস্তানে যেভাবে জোর করে নিয়ে যায় আমাদের সোনালি আঁশ পাট, চা, চামড়া। ইয়াকুবের কথায় সম্মতি জানিয়ে ধীরেন কাকা বললেন, তোরা যদি বড়ো হয়ে একদিন জজ ব্যারিস্টার হতে পারিস তখন বুঝতে পারবি, পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের সোনালি আঁশ থেকে শুরু করে কত কিছু নিয়ে যাচ্ছে বিনিময়ে কিছুই দিচ্ছে না। দিচ্ছে বাঙালিদের চাকর বাকরের চাকরি। তখনি মনসুর চাচা এলেন ধীরেন কাকার সেই শান্ত স্নিগ্ধ কলাপাতার সবুজ দিয়ে ঘেরা বাড়ির ছোটো কাচারি ঘরে। আফ্রিকা মহাদেশের কালো মানুষদের প্রতি ইংরেজদের অবিচার-অত্যাচারের আরো কিছু শোনালেন- মনসুর চাচা তিনি বললেন, দক্ষিণ আফ্রিকার রোডেশিয়া ইংরেজদের বসতি, সেই বসতির আশেপাশে যদি কোনো কালো মানুষকে কখনো ইংরেজরা দেখে থাকে তবে সাথে সাথে গুলি করে মেরে ফেলেন। এই নিয়ে সেই দেশে খুব মিছিল মিটিং হলো, আরো অনেক লোককে গুলি করে মারল কারণ হলো কালো মানুষগুলো নিজ দেশে চাকরের জীবনযাপন করছিল। তারই প্রতিবাদ করল সেই সকল অসহায় নিগৃহীত অত্যাচারী শ্রেণির মানুষগুলো সকল সজ্যের সীমা ক্রমান্বয়ে ইংরেজেরা যখন ছাড়িয়ে যেতে লাগল তখনি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করল কালো মানুষগুলো। তারা যেহেতু নিজ দেশে পরজমিন, যেমন আমরা পূর্ব পাকিস্তানিরা বিহারিদের পাঞ্জাবিদের অত্যাচারে অত্যাচারিত পেস কাকা যোগ করলেন। তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতেই অনেক লোককে হত্যা করেছিল। পরে ইংরেজদের অত্যাচারের কথা শুনে আমিও সঙ্গে সঙ্গেই বললাম, আমরা একদিন যে-কোনো অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবো। কোনো অবস্থাতেই নিজের দেশে অন্য দেশের মানুষ এসে রাজা হয়ে বসবে এটা হতে দেবো না।

ধীরেন কাকা বললেন, তোকেই আগে পাঠাব, রোডেশিয়া তোরা ম্যাট্রিক দিবি কোন বছরে?

বুলবুল বলল আগামী বছরের মার্চ মাসে আমাদের ম্যাট্রিক পরীক্ষা। বিপিন হাই স্কুলে আমরাই নতুন সিলেবাসের প্রথম পরীক্ষার্থী। সোনা মাখানো দিনগুলো আমাদের ভালোই চলছিল, বর্ষা গিয়ে শরৎ এসেছে। বাউশিয়া চরে কয়েক হাজার বিঘায় কাশ ফুল ফুটেছে দূর থেকে দেখলে মনে হবে সাইবেরিয়ায় কয়েক হাজার রাজহাঁস এসে বসে আছে। চর দুটিতে এটিও মনে হতে পারে শরৎ আকাশে সাদা পেঁজা তুলোর মতো মেঘগুলো এসেছে দুই চরে। বছর দুয়েক হয়নি চরে বালি নেমে এমন হয়েছিল যে, ধীরেন কাকা ধরেই নিয়েছিলেন

আগামী দুই চার বছরের মধ্যে কাশফুল ফুটবে না। অথচ মা দুর্গা পৃথিবীতে পা রাখার আগেই আশ্বিনে মৃদুমন্দ শীত আর গরমের মধ্যে দুটিকেই মা দুর্গা যেন নিজের হাতেই সাজিয়ে দিলেন কাশফুলে।

দিন কয়েকের ভেতরে বেড়া বাজারের সবচেয়ে ধনী অজিত পাকড়াশীদের পুজোমণ্ডবে মা দুর্গা বানাতে আসবে শাহজাদপুর থেকে কার্ত্তিক পালের দিল পুজোর শুরুতেই। বেড়াবাজারের মধুসুদন তার দালাল নিয়ে নামবে যাত্রায়, পুজোর আনন্দের পরপরই আসবে মুসলমানদের ঈদ, মাঝখানে বেশ কিছুদিন থাকবে ছেলে-মেয়েদের স্কুল বন্ধ। পুজোর আর ঈদের ছুটিতে আত্মীয় স্বজনেরা যাবে গ্রাম গ্রামান্তরে, কইজুড়িতে যাওয়া হয়নি গত বছর পুজোয়। শ্বশুরপক্ষ মনে মনে রাগ করে ঐ র‍্যালি ব্রাদার্সের পাটগুলোকে ঢাকার জুটমিলে যথাসময়ে না পাঠাতে পারায়। আমার এবং মনসুরের কারো ছুটিই হলো না। মনসুর যেতে চেয়েছিল সাঁথিয়ায় তার বোনের বাড়িতে। বোনটির স্বামী গত বছররই গত হয়েছেন গোখরা সাপের কামড়ে। বলেছিল মনসুর, আমি, ভুদেব, ইয়াকুব, বুলবুল, ধীরেন কাকার কাচারিঘর থেকে বের হয়ে কিছুদূর আসতেই দেখি গনি মৌলবি দাঁড়িয়ে আছে বাবলা গাছের নীচে। আমাদের দেখে কয়েকপা এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমাদের সামনে। আমরা সে স্কুলের ছাত্র গনি মৌলবি খুব ভালো করেই জানেন যেহেতু গনি চাচা আমাদের এলাকার বাসিন্দা তবে এই এলাকার বাসিন্দা হলেও ভিক্ষা করেন ঢাকায় আজিমপুর গোরস্থানের গেটে। চাচাকে গফুর ভাই নিজে বার কয়েক দূর থেকে দেখে এসেছে। অথচ গনি মৌলবি ধীরেন কাকাকে নাকি বলেছিলেন, ঢাকায় তিনি চাকরি করেন এক অফিসে। সেই গনি এসে দাঁড়ালেন আমাদের চার জনের সামনে। বুলবুল জিজ্ঞাসা করল, চাচা ঢাকার খবর কী?

ঢাকা থেকে রাত্রেই পালিয়ে এসেছিলাম শিবালয়ে আমার ফুফুর বাড়ি। হঠাৎ পালিয়ে এখানে কেন? ভুদেবের প্রশ্ন?

তোরা এখনও খবর পাসনি! গত পরশু রাতে পাকিস্তানি আর্মিরা ঢাকায় অবস্থান করেছে। হাজার হাজার নিরীহ বাঙালিদের ঘর-বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে। শেখ মুজিব বাঙালিদের স্বাধীনতা চাইলে সেই স্বাধীনতা চাইবার অপরাধে শাস্তি দিয়েছে, মেরে ফেলেছে। পাকিস্তানিরা যাই করুক না কেন, দেশ আমাদের স্বাধীন হবেই হবে, আমরা স্বাধীন করবোই। এই আমার শেষ কথা।

মুর্শিদা আক্তার মীম, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, মাওলানা আশরাফ আলী আইডিয়াল হাইস্কুল, ঢাকা

[প্রথম ও দ্বিতীয় পর্বে আমরা জেনেছি ১৯৭১ সালের মার্চ ও এপ্রিল মাসে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো। এবার জানাব কী ঘটেছিল ১৯৭১ সালের মে মাসে।]

মুক্তিযুদ্ধের দিনরাত্রি

আবুল কালাম আজাদ

সকাল নয়টার মধ্যে একটা মাইক্রোবাস এসে গেটে দাঁড়ালো। ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে নেমে এলেন মুহিব চাচা। আমাদের তাড়া দিয়ে বললেন-কই কই, তোমরা রেডি তো?

আমরা মোটামুটি রেডি ছিলাম। আমাদের বন্ধুরা আগেই এসে উপস্থিত। শিলা আপার বন্ধুরাও এসেছে।

তবে যা একটু দেরি হচ্ছিল শিলা আপা আর ওর বন্ধুদের জন্য। ওরা সাজগোজ করতে একটু সময় নিচ্ছিল। বড়ো চাচা ড্রইং রুমে পায়চারি করছিলেন আর বলছিলেন-মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে যাব, এতে এত সাজগোজের কী থাকতে পারে?

অবশেষে সাড়ে নয়টায় সবাই বাসে উঠলাম। বাসে উঠতেই আমাদের হাতে নাস্তার প্যাকেট দেওয়া হলো। কেক, মিষ্টি, আপেল, সমুচা, একটা সিদ্ধ ডিম, আর এক বোতল পানি।

বাস চলতে শুরু করল।

মুহিব চাচা ড্রাইভারকে বললেন-তাড়াহুড়োর কিছু নেই। দেখেশুনে আস্তেআস্তে চালাবে।

আমরা খাচ্ছি। তখন মুহিব চাচা শুরু করলেন-স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের জন্ম হয়েছিল ১৯৭১ সালের ২৫ শে মে। ৫০ কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার বসানো হয়েছিল রাজশাহী সীমান্তে পলাশির আম্রকাননে। এটা সংগ্রহ করেছিলেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমেদ এবং তিনি অবিলম্বে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচার ও প্রচারণা শুরু করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠানগুলো সারা দেশের মানুষকে উজ্জীবিত করেছিল, মানসিক শক্তি যুগিয়েছিল। কলকাতার আকাশবাণী, বিবিসি, রেডিও অস্ট্রেলিয়া, ভয়েস অব আমেরিকা এরাও আমাদের যুদ্ধের খবর প্রচার করত। কিন্তু দেশের মানুষ নিজেদের কণ্ঠ শুনতে চাইত। মানুষের সেই তৃষ্ণা মিটিয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান শোনার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে থাকতাম। খবর, গান, কবিতা, কথিকা এসব অনুষ্ঠান তো ভালো লাগতই, আমাদের সবচেয়ে প্রিয় অনুষ্ঠান ছিল এম আর আখতার মুকুলের 'চরমপত্র'। সেখানে মুক্তিযোদ্ধাদের নানারকম খবর যেমন থাকত, তেমন থাকত ওদের বিপর্যয়ের খবরও। ব্যঙ্গাত্মক ভাষায় চরমপত্র পাঠ করা হতো। বাংলাদেশের যে-কোনো অঞ্চলের মানুষ যাতে সমান আনন্দ পায় সেজন্য সব অঞ্চলের ভাষা-ই থাকত চরমপত্রে। যুদ্ধের

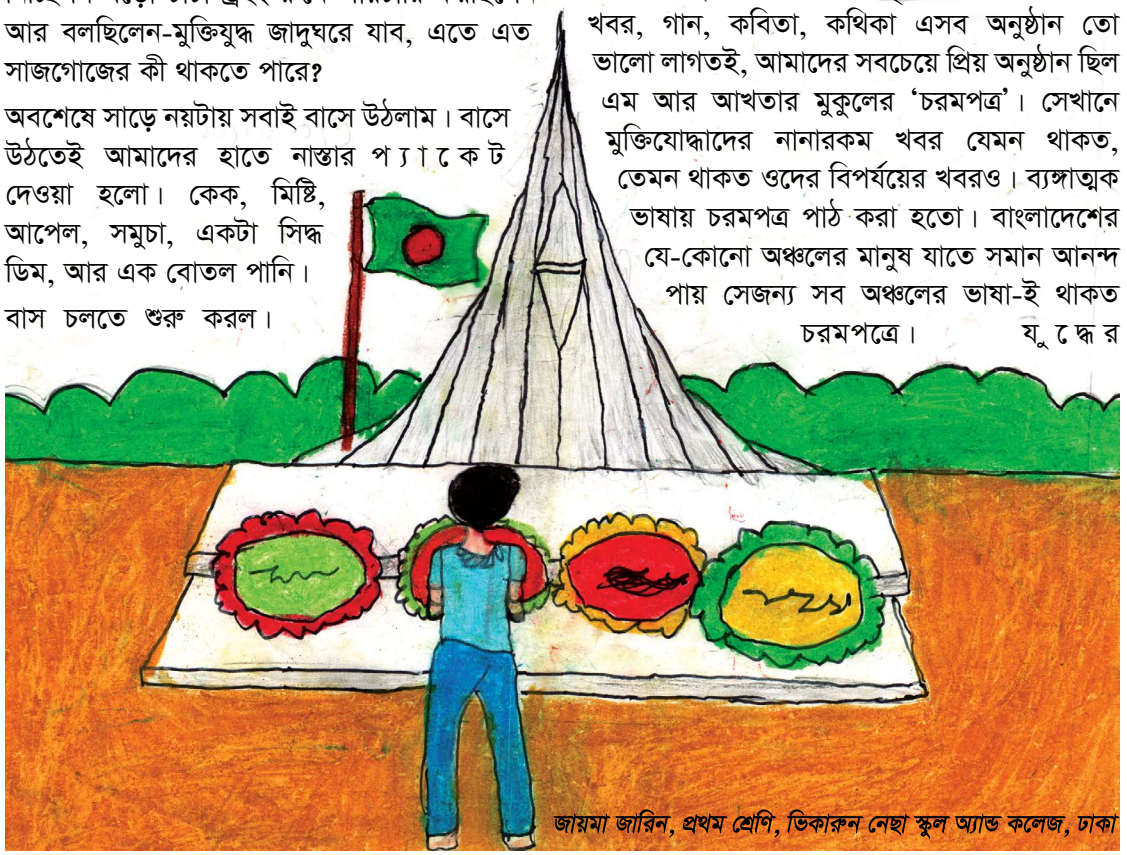

জায়মা জারিন, প্রথম শ্রেণি, ভিকারুন নেছা স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

সেই ভয়ংকর দিনগুলোতে 'চরমপত্র' অনুষ্ঠান রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে জুগিয়েছিল অদম্য সাহস, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের হৃদয়ে সৃষ্টি করেছিল অপরিসীম মনোবল, আর দখলীকৃত এলাকার কোটি কোটি মানব সন্তানের জন্য এই অনুষ্ঠান ছিল আলোকবর্তিকা। চরমপত্রের কিছু কিছু অংশ আমাদের মুখস্ত হয়ে গিয়েছিল। তোমাদের একটু শোনাচ্ছি-

'এদিকে আগায় খান পাছায় খান-খান আব্দুল কাইউম খান আবার খুলেছেন, মাফ করবেন, 'মুখ' খুলেছেন। তিনি আবদার করেছেন-আবার আদমশুমারি করে নির্বাচন করতে হবে। অবশ্য তিনি ইসলামাবাদের সামরিক কর্তৃপক্ষকে আর ক'টা দিন সবুর করতে বলেছেন। কেননা 'দন্তবিহীন

সীমান্ত শার্দুল'-
খান কাইউম খান পরিষ্কারভাবে ঘোষণা দেন যে, বাংলাদেশ থেকে আরো কিছু বাঙালিকে উচ্ছেদ করার পর আদমশুমারি ও নির্বাচন করতে হবে। আয় মেরে জান, পেয়ারে দামান, খান কাইউম খান তোমার ক্যারদারি আর কত দেখাবে? মনে নেই তুমি যখন সীমান্ত প্রদেশের প্রধানমন্ত্রী ছিলে, তখন সেখানকার সাধারণ নির্বাচনে তোমার মনোনীত প্রার্থীরা এক একটা এলাকায় মোট ভোটার সংখ্যার থেকেও বেশি ভোট পেয়েছিল? কিন্তু সত্তুরের নির্বাচনে তোমার মুরুব্বি পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর তত্ত্বাবধানে যে নির্বাচন হয়েছে তাতে বাংলাদেশে তোমার পার্টির প্রার্থীদের অবস্থা একেবারে ছেছ্হেরা হওয়াতেই কী তোমার উর্বর মস্তিষ্কে নতুন প্ল্যান গজাচ্ছে? কী বুদ্ধি তোমার? এত বুদ্ধি নিয়ে রাতে তুমি ঘুমাও কেমন করে?

জামাতে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারি তোফায়েল আহমদ আরো এক ডিগ্রি এগিয়ে গেছেন। ইনি ধুয়া তুলছেন প্রথম নির্বাচনের ভিত্তিতে আবার সাধারণ নির্বাচন করতে হবে। এ যেন বাচ্চা মেয়েদের এক্কাদোক্কা খেলা আর কী? থুক্কু দিলেই ফের পহলেসে। কিন্তু তোফায়েল আহমদ ভাইয়া; সরি মাওলানা তোফায়েল, পশ্চিম পাকিস্তানে আপনারা যা খুশি তাই করতে পারেন; আপনাদের খাসি ইচ্ছে করলে আপনারা লেজ দিয়ে জবাই করতে পারেন-তাতে আমাদের কিস্সু যায় আসে না। কিন্তু দোহাই আপনার, বাংলাদেশের ব্যাপারে আর মাথা গলাবেন না।

এবারের সাধারণ নির্বাচনে আপনাদের ক্যানডিডেটদের অবস্থা দেখেছেন? এমনকি মিরপুর-মোহাম্মদপুরের অবাঙালি এলাকা থেকেও আপনার জামাতে ইসলামীর মাইনে করা আমীর গোলাম আজম পর্যন্ত ধরাশায়ী হয়ে পড়লেন। বাংলাদেশের মাটি খুবই পিছ্লা কিনা? কয়েক কোটি টাকা খরচ করার পরেও তো একজন প্রার্থীও নির্বাচিত করতে পারলেন না। এই দুঃখে কি এখনো সিনা চাপড়াচ্ছেন?'

মুহিব চাচার কথার ঢং শুনেই আমরা হেসে অস্থির।

এম আর আখতার মুকুলের পাঠ শুনলে না জানি কেমন মজা পেতাম!

মুহিব চাচা বোতল থেকে পানি খেলেন। বড়ো চাচা বললেন-তবে মে মাসের মধ্যেই কিন্তু গেরিলা যোদ্ধারা ঢাকা শহরে ঢুকে পড়ে। ১৭ই এবং ১৮ই মে ঢাকা শহরের ছয় জায়গায় হ্যান্ড গ্রেনেড ছোঁড়া হয়। এসব জায়গার মধ্যে রয়েছে প্রাদেশিক সেক্রেটারিয়েট, স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান, হাবিব ব্যাংক, মর্নিং নিউজ অফিস, রেডিও পাকিস্তান আর নিউমার্কেট। পাকিস্তানি হানাদার সৈন্যদের দখলকৃত ঢাকা নগরীতে মুক্তিযোদ্ধাদের এ ধরনের গেরিলা তৎপরতা সামরিক জান্তার কাছে নিঃসন্দেহে এক ভয়ংকর দুঃসংবাদ বৈকি। অবশ্য এর আগে মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষ থেকে প্রচারপত্রও বিলি করা হয়েছে।

মিলিশিয়ানদের ঢাকায় আনা হলো কাফের মারতে। তাদের বলা হলো, তোমাদের কলকাতায় নিয়ে যাচ্ছি। সব হিন্দু মারতে হবে।

অশিক্ষিত মিলিশিয়া বাহিনী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ঢাকার তেজগাঁও এয়ারপোর্টে নেমেই উল্লাস করতে লাগল- 'কালকাত্তা আ গিয়া'। তারপর তারা নির্বিচারে কাফের মারতে পথে নামল। মানুষ ধরে ধরে কলেমা পড়তে বলে। হিন্দু মানুষ অটল বিহারি নাম শুনেই মোসাফা করে ছেড়ে দেয়। কারণ তার নামের সঙ্গে 'বিহারি' থাকায় সে আর বাঙালি নয় প্রমাণিত হয়ে গেল। ওরা মূর্খ হলেও পথে পথে টুপি পড়া মানুষ, মসজিদ আর আজান শুনে এক সময় বেঁকে বসল। এরা তো সব মুসলমান, কাফের কোথায়? সরকার তাদের ধোঁকা দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে বুঝতে পেরে ওরা ফিরে যেতে গোঁ ধরল। অনেক বুঝিয়েও আর রাখা গেল না। ওরা চলে গেল পশ্চিম পাকিস্তানে।

অগত্যা পাঞ্জাব আর বেলুচ সেনারা মুক্তিবাহিনীর মার খেতে লাগল। গ্রামে গেলে কুপিয়ে মারে। পাহারাদারি করতে গিয়ে গ্রেনেডে বিচ্ছিন্ন হয়। মুক্তিসেনাদের অতর্কিত আক্রমণে ওরা এত ভীত হয়ে পড়েছে যে, রাতের বেলা শেয়ালের শব্দ পেলেও 'হ্যান্ডস্ আপ' করে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ ভয় পেয়ে ফাঁকা মাঠে পাগলের মতো গুলি চালাতে থাকে পশ্চিমা সেনারা।

কিন্তু বাংলার দামাল ছেলে মুক্তিসেনারা বাংলার পথ ঘাট, বনবাদাড়, নদীনালা সব চেনে। কোন পথে এসে কোথা দিয়ে ওদের খতম করে পালিয়ে যায়, তা ওরা চোখেও দেখতে পায় না।

খান সেনারা দোকানের মাল নেয়, মিষ্টি খায়, পয়সা দেয় না। পয়সা চাইলেই মারে। শেষে দোকানে খান সেনারা হামলা করলেই খাদ্যে বিষ মিশিয়ে পালাতে লাগল। সেই বিষ মেশানো খাবার খেয়েও মরতে লাগল পশুরা।

ময়মনসিংহের শংখ নদীতে শুকনো নারিকেল বোঝাই নৌকা চলত জোছনা রাতে। খান সেনারা মুক্তিবাহিনীর নৌকা মনে করে গুলি চালায়। মাঝিরা ডুব সাঁতার দিয়ে পালিয়ে যায়। গুলিতে গুলিতে নৌকা ডুবে যায়। সারা নদীতে ভাসতে থাকে নারিকেল। খান সেনারা মুক্তিবাহিনী সাঁতরে পালাচ্ছে ভেবে সারারাত গুলি চালিয়ে হয়রান হয়। সকালে গুলি ফুরিয়ে যায়, কিন্তু নারিকেল তেমনি ভাসতে থাকে। ওরা এমনি ভীত হয়ে উঠেছিল মুক্তিবাহিনীর নামে।

হ্যাঁ বড়ো চাচা ঠিকই বলেছেন, নির্বিচারে নিরীহ-নিরপরাধ বাঙালি হত্যা, নারী লাঞ্ছনা, আর জ্বালাও-পোড়াও এর মাধ্যমে হানাদাররা দখলদারিত্ব কায়েম করতে চেয়েছিল। কিন্তু পারেনি। দিন দিন, প্রতিদিন এই বাংলায় তারা কোণঠাসা হতে থাকে।

মুহিব চাচা বললেন-আমরা আগারগাঁও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নিকটে এসে গেছি। রাস্তায় একটু জ্যাম লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এই জ্যামের সময়টুকু কবিতা শুনে কাটাতে চাই। স্বাধীনতার কবিতা। অন্তত দু'টো কবিতা শোনা যাবে। কে কে আবৃত্তি করবে?

শিলা আপার বান্ধবী মুনা আপা আবৃত্তি করল কবি শামসুর রাহমানের কবিতা 'স্বাধীনতা তুমি।'

স্বাধীনতা তুমি
রবিঠাকুরের অজর কবিতা, অবিনাশী গান
স্বাধীনতা তুমি
কাজী নজরুল ঝাঁকড়া চুলের বাবরি দোলানো
মহান পুরুষ, সৃষ্টিসুখের উল্লাসে কাঁপা-
স্বাধীনতা তুমি
শহীদ মিনারে অমর একুশে ফেব্রুয়ারির উজ্জ্বল সভা
স্বাধীনতা তুমি
পতাকা-শোভিত শ্লোগান-মুখর ঝাঁঝালো মিছিল।
স্বাধীনতা তুমি

ফসলের মাঠে কৃষকের হাসি।
স্বাধীনতা তুমি
রোদেলা দুপুরে মধ্যপুকুরে গ্রাম্য মেয়ের অবাধ সাঁতার।
স্বাধীনতা তুমি
মজুর যুবার রোদে ঝলসিত দক্ষ বাহুর গ্রন্থিল পেশী।
স্বাধীনতা তুমি
অন্ধকারের খাঁ খাঁ সীমান্তে মুক্তিসেনার চোখের ঝিলিক।... *[সংক্ষিপ্ত]*

কবিতায় স্বাধীনতাকে অনেক সুন্দর সুন্দর উপমায় সাজানো হয়েছে। বাংলার প্রকৃতিকে তুলে ধরা হয়েছে অনুপম ছন্দে। মুনা আপার কণ্ঠের মাধুর্য এবং প্রকাশ ভঙ্গি আমাদের শ্রবণ ইন্দ্রিয়কে মুগ্ধ করল।

তারপর আমার বন্ধু শুভ্র আবৃত্তি করল আরেকটি কবিতা। এটাও কবি শামসুর রাহমানের কবিতা 'তুমি বলেছিলে'। এ কবিতায় আছে স্বাধীনতা যুদ্ধকালীন সময়ে হানাদারদের বর্বরতার চিত্র। শুভ্রর কণ্ঠ দরাজ। ওর কণ্ঠে কবিতাটা মানিয়েছে খুব।

দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে নতুন বাজার
পুড়ছে দোকান-পাট, কাঠ,
লোহা-লক্করের স্তূপ, মসজিদ এবং মন্দির।
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে নতুন বাজার।
বিষম পুড়ছে চতুর্দিকে ঘর-বাড়ি।
পুড়ছে টিয়ের খাঁচা, রবীন্দ্র রচনাবলি, মিষ্টান্ন ভাণ্ডার,
মানচিত্র, পুরনো দলিল।
মৌচাকে আগুন দিলে যেমন সশব্দে
সাধের আশ্রয় ত্যাগী হয় মৌমাছির ঝাঁক,
তেমনি সবাই
পালাচ্ছে শহর ছেড়ে দিগ্বিদিক। নবজাতককে
বুকে নিয়ে উদ্ভ্রান্ত জননী
বনপোড়া হরিণীর মত যাচ্ছে ছুটে।
অদূরে গুলির শব্দ, রাস্তা চষে জঙ্গী জীপ।
আর্ত শব্দ সবখানে।
আমাদের দু'জনের মুখে খরতাপ। আলিঙ্গনে থরো থরো
তুমি বলেছিলে,
'আমাকে বাঁচাও এই বর্বর আগুন থেকে, আমাকে বাঁচাও,
আমাকে লুকিয়ে ফেলো চোখের পাতায়
বুকের অতলে কিংবা একান্ত পাঁজরে
আমাকে নিমেষে শুষে নাও চুম্বনে চুম্বনে।'
দাউ দাউ পুড়ে যাচ্ছে নতুন বাজার,
আমাদের চৌদিকে আগুন,
গুলির ইস্পাতী শিলাবৃষ্টি অবিরাম।
তুমি বলেছিলে আমাকে বাঁচাও।
অসহায় আমি তাও বলতে পারিনি।

জাদুঘরে পৌঁছে আমরা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলাম আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সব প্রামাণ্য ইতিহাস। পুরো মুক্তিযুদ্ধটাই আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল। মনে হতে লাগল, আমরা যেন সেই আগুনঝরা ১৯৭১ সালে অবস্থান করছি।

আমরা যে-সব বিষয়ে জানতে পারলাম তা হলো- অসহযোগ আন্দোলন ও ৭ই মার্চের ভাষণ, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণা, প্রথম প্রতিরোধ, উদ্বাস্তু সমস্যা, মুজিবনগর সরকারের প্রতিষ্ঠা, সেক্টর বিভাজন, সংগঠিত সামরিক প্রতিরোধ, জনযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারের কর্মকাণ্ড, সেক্টর ও ব্রিগেড কমান্ডারদের অধীনে সশস্ত্র যুদ্ধ, নৌকমান্ডো, বিমানবাহিনীতে বিমানযোদ্ধা, স্বাধীন বাংলা বেতার, গণমাধ্যম, সামরিক প্রশিক্ষণ শিবির, মুক্ত এলাকা, আন্তর্জাতিক সংহতি, দেশীয় দালালদের ভূমিকা, রাজাকার বাহিনী, শান্তিকমিটি ও আলবদর বাহিনী, দেশের অভ্যন্তরে প্রতিরোধ, নারীদের ভূমিকা, নারী নির্যাতন, যৌথ বাহিনী গঠন ও ডিসেম্বরের চূড়ান্ত লড়াই, মিত্রবাহিনীর ভারতীয় সদস্যদের আত্মদান, বুদ্ধিজীবী হত্যা এবং চূড়ান্ত বিজয়।

রাজাকার, দেশীয় দালাল, আর হানাদারদের নির্মমতার অনেক স্মৃতিচিহ্ন আমাদের মনকে ভারাক্রান্ত করেছে। তার মধ্যে একটির কথা না বললেই নয়। একটি মেয়ে শিশুর জামা সংরক্ষিত আছে। শিশুটার বয়স চার বছর হবে। তার বাবা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন। হানাদারদের নিয়ে কয়েকজন রাজাকার শিশুটির বাবাকে খুঁজতে যায়। বাবাকে না পেয়ে ওরা রাগে হিংস্র পশু হয়ে যায়। শিশুটিকে আছড়িয়ে মেরে ফেলে। আমরা এখন ওকে শিশু বলছি। কিন্তু ও যদি বেঁচে থাকত তো আজ ওর ঘরসংসার থাকত। সন্তান থাকত। ও মমতাময়ী মা হতো। দেশ আর দেশের মানুষের জন্য ওর অনেক অবদান থাকত। ঘটনাটা জেনে, জামাটার দিকে তাকিয়ে আমরা কেউ চোখের পানি ধরে রাখতে পারিনি। মানুষ এত নিষ্ঠুর হতে পারে!

জাদুঘরের বাইরে বই রাখা আছে। পরিদর্শন শেষে

দর্শনার্থীরা তাদের অনুভূতি, আত্মোপলব্ধি লিখে রাখতে পারে।

বড়ো চাচা বললেন-তোমরা লিখে রেখে যাও তোমাদের উপলব্ধি।

শিলা আপা লিখল-মুক্তিযুদ্ধ আমাদের গৌরবময় অধ্যায়। এই মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমেই আমরা বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন দেশ হিসেবে পরিচয় করে নিয়েছি। স্বাধীনতাকে সমুন্নত রাখতে দেশ আর জাতির প্রতি আমাদের হৃদয়ে নিখাদ ভালোবাসা রাখতে হবে।

আমার বন্ধু রাজন লিখল-মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অহংবোধের জায়গা। মুক্তিযোদ্ধারা আমাদের সূর্য সন্তান। কিন্তু শুধু অহংকারকে বুঝলেই হবে না, হৃদয়ে অহংবোধ জাগিয়ে রাখলেই চলবে না। এই মুক্তিযুদ্ধের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের অনেক বেদনা, অনেক কষ্ট, অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা। সেসবকেও মনে রাখতে হবে। যারা আমাদের দুঃখকষ্ট, লাঞ্ছনা-গঞ্জনার কারণ হয়েছে, সেই সব হানাদার, তাদের দোসর সবার প্রতি ঘৃণা রাখতে হবে চিরকাল।

শিলা আপার বন্ধু মিনু আপা লিখল- যে-কোনো জাতির স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চাই একজন সত্যিকারে কাণ্ডারি। আমরা পেয়েছিলাম দক্ষ কাণ্ডারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। আজীবন তিনি ন্যায়ের পথে, অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে গেছেন। তিনি বাঙালি জাতির স্থপতি। বঙ্গবন্ধু, তাঁর সকল সহযোদ্ধা, আমাদের সকল মুক্তিযোদ্ধা, মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশ না নিলেও যারা বিভিন্নভাবে মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্য করেছে, সাহস যুগিয়েছে, মনে মনে স্বাধীনতা কামনা করেছে তাদের সবার প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। আর যারা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছে, নানাভাবে হানাদারদের দালালি করেছে তাদের প্রতি রইল ঘৃণা।

এভাবে সবাই অনেক সুন্দর এবং প্রয়োজনীয় কথা লিখল। আমিও লিখলাম কিছু। সব নাহয় উল্লেখ নাই করলাম।

তারপর সবাই আবার গাড়িতে চড়লাম। তখন কেমন যেন নীরবতা বিরাজ করছিল আমাদের মাঝে। সেই শিশুটার জামাটা চোখে ভাসছিল। রক্তমাখা জামা। আহা! কি কষ্ট পেয়ে অবুঝ শিশুটা মরে গেছে! যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে বাবা যখন জেনেছে তখন কেমন হয়েছিল তার মনের অবস্থা? স্বাধীনতার জন্য শুধু যুদ্ধই করলেন না, বুকের ধনকেও উৎসর্গ করলেন তিনি।

তোমাদের সবার প্রতি অনুরোধ, সময়-সুযোগ করে একবার ঘুরে আসো ঢাকার আগারগাঁও-এ অবস্থিত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর।

সাকিব, ডিএফপি, ঢাকা

নাবিলা খাতুন, দশম শ্রেণি, বর্ণমালা আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, দনিয়া, ঢাকা

বড়োদের মুখে শুনে ছোটোদের লেখা মুক্তিযুদ্ধের কথা

বাংলাদেশ কীভাবে স্বাধীন হলো?

রাবিতা তাহসীন সারাহ

আমার নাম সারাহ। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনগণের উদ্দেশে স্বাধীনতার ডাক দিয়ে বলেন 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এরপর ২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালিদের উপর হামলা করে। ২৬ শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এর ভিত্তিতে ২৬ শে মার্চ শুরু হয় আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানেই জাতি মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এগিয়ে আসছে। তাদের ঠেকানোর জন্য মুক্তিযোদ্ধারা অবস্থান নিয়েছে গ্রামে। ভোর থেকেই পাকিস্তানি বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের উপর গোলাবর্ষণ শুরু করল। এদের মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাদের সহায়তার প্রয়োজন। দুপুরের দিকে ভারতীয় কয়েকজন সেনা এসে পৌঁছল। শুরু হলো তীব্র আক্রমণ। প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ। অনবরত গুলি চালাতে চালাতে পাকিস্তানি সৈন্যরা পিছু হটতে শুরু করল। এভাবে আমাদের গ্রাম শত্রু মুক্ত হলো। নয় মাস ধরে এ যুদ্ধ চলে। ১৯৭১ সালের ১৬ ই ডিসেম্বর আমরা বিজয় লাভ করি। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়।

৭ই মার্চের ভাষণ

ইনফিদার আহমেদ বাঁধন

মার্চের ৭ তারিখ আমার বাবার অফিসে নাকি প্রোগ্রাম ছিল। মন্ত্রী এসেছিলেন, সচিব এসেছিলেন। বাবা আমাকে এক এক করে ছবি দেখাচ্ছিল। আর বাবা বলছিল আগামী ৯ই মার্চ ছুটির দিনে আমাদের অফিসে তোমাকে স্যুটিং-এ নিয়ে যাব। আর আমি তো তখন থেকে স্বপ্ন দেখছিলাম স্যুটিং কেমন হয়, কি করে হয়, স্যুটিং-এ গিয়ে কী করতে হয়। আবার রাতের বেলা স্বপ্ন দেখছিলাম আমি স্যুটিং-এ কথা বলছি। আমি বুঝি নায়ক। তারপর ভয়ে সংকোচে বাবাকে বললাম বাবা আমাদের মুভির নাম কী হবে? বাবা বলল এটা তো মুভি না। আমি প্রশ্ন করলাম কী তাহলে? এটা হলো একটা তথ্যচিত্র— এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। রচনা করেছেন নাসরীন মুস্তাফা আর পরিচালনা করেছেন আব্দুল্লাহ আল হারুন।

সবকিছুর পর সেই কাঙ্ক্ষিত ৯ই মার্চ ২০১৮ তারিখের শুক্রবার দিনটা পেয়ে গেলাম। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠলাম। বাবার অফিসের বনভোজনে পাওয়া ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়ে রেখেছিলাম। বাবা বলল তুমি রেডি হও আমিও রেডি হচ্ছি। বাবার অফিসে পৌঁছে নাশতা করলাম। তারপর স্যুটিং-এর গাড়ি করে ৩২ নং বঙ্গবন্ধু জাদুঘর-এর সামনে গেলাম। যেখানে মুক্তিযোদ্ধা দাদু আমাদের সব গল্প বলছিল আর আমরা মনোযোগ দিয়ে সব শুনছিলাম। বাবাকে বললাম বাবা আমি তো স্যুটিং-এ এসেছি। আমি কি শুধু দাদুর কথা শুনব? না আমিও অভিনয় করব ? বাবা বলল দাদুর কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শোনো এবং বুঝো তারপর আমায় বলো কি শুনেছ? দাদুর কাছে শুনলাম ১৯৭৫ সালের সেই নির্মম ইতিহাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কত বড়ো মানুষ ছিলেন। যার জন্ম না হলে বাংলাদেশের মানচিত্র হতো না। তিনি না থাকলে মায়ের ভাষা বাংলা ভাষায় কথা বলতে পারতাম না, আমরা বাংলায় স্বাধীন ভাবে চলতে পারতাম না তাঁর একদিনের ভাষণে বাংলার সব মানুষ স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। সেই ৭ই মার্চ ১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ভাষণে বলেছিলেন 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম'।

এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম- সেই থেকে স্বাধীনতা শব্দটি আমাদের। দাদু আরো শুনালেন বঙ্গবন্ধুর জন্যই আমাদের স্বাধীনতা। সেই থেকে ৭ই মার্চের ভাষণ বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ। প্রথম আয়োজনের স্যুটিং শেষ হলো। আমরা এবার বঙ্গবন্ধু জাদুঘরে ঢুকলাম। সেখানে গিয়ে দেখলাম দেয়ালে দেয়ালে বুলেটের চিহ্ন মেঝেতে মেঝেতে রক্তের দাগ। আমার খুব কষ্ট লেগেছে। বাবা এগুলো কেন? বাবা বলল ১৯৭৫ সালে একদল খারাপ মানুষ বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবারের সবাইকে মেরে ফেলেছে। ঠিক তোমার মতো বঙ্গবন্ধুর এক সন্তান ছিল তার নাম শেখ রাসেল। তাকেও ওরা মেরে ফেলেছে। বাবার থেকে সব গল্প শুনে আমার খুব কষ্ট লেগেছে। আমি চোখে পানি ধরে রাখতে পারি নি। এক মুহূর্তে দেখি চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। বাবাকে বললাম মানুষ এমন হয়? তারপর স্যুটিং-এর গাড়িতে করে বাবার অফিসে গেলাম। দুপুরের খাবার শেষে আবার স্যুটিং- এ গেলাম। এবার দাদু আমাদের এবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বঙ্গবন্ধুর তর্জনী উঠানো সেই ছবির কাছে নিয়ে গেলেন। আর বললেন আজকের এই ভাষণ 'মেমরি অব দ্য ওয়ার্ল্ড'। আর দাদু খুব ঘুরে ঘুরে স্বাধীনতা জাদুঘর দেখালেন। স্যুটিং-এ যদিও আমি কথা বলতে পারিনি। শুধু দাদুর কথা শুনেছি।

চতুর্থ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ঢাকা।

বোকা শিয়ালের কাণ্ড

ইউনুস আহমেদ

এক যে ছিল শিয়াল। সে ছিল ভারি বোকা। তার বোকামির জন্য শিয়াল সমাজের অন্য শিয়ালরা খুব হাসাহাসি করে। বোকা শিয়ালটা থাকে ছোট্ট এক জঙ্গলে। জঙ্গলের ভেতর প্রকাণ্ড এক মরা গাছের গুড়ি। সেই গুড়ির খোঁড়লে বাস করে বোকা শিয়াল। সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে। তাই সে খুব একটা বাড়ি থেকে বের হতে চায় না। একদিন তার প্রচণ্ড ক্ষুধা পেল। এখন কী করা যায়? সে জঙ্গল থেকে বের হলো। জঙ্গল থেকে একটু দূরেই লোকালয়। সেখানে ছনের কুটিরে থাকে এক কৃষক। একাই থাকে সে। কৃষক মুরগি পালন করে। কুটিরের পাশে মুরগির ঘর। ছানাপোনা নিয়ে এক মুরগি থাকে সেখানে।

একদিন বোকা শিয়াল জঙ্গল থেকে বের হয়ে লোকালয়ের দিকে ছুটল। কৃষকের ছনের কুটিরের কাছে এসে দেখে মুরগি আর তার ছানাপোনা। বোকা শিয়ালের ভারি লোভ হলো। সে সোজাসুজি মুরগিকে বলল, 'এই মুরগি তোর ছানাপোনাদের আমার কাছে পাঠা, আমি ওদের খাব। আমার ক্ষিধে পেয়েছে'। ছানাপোনাদের হারানোর ভয়ে মুরগির বুকটা কেঁপে ওঠল। মুরগি মনে মনে ভাবল ভয় পেলে হবে না। ভয় পেলে তো হেরে গেলে। সে একটা বুদ্ধি করল। মুরগি খুব মোলায়েম গলায় বলল, 'শিয়াল ভায়া, শিয়াল ভায়া, তুমি আমার ছানাগুলোকে খেতে চেয়েছো সে তো অতি ভালো কথা। তবে এক কাজ করো, তুমি কুটিরের ভেতর গিয়ে একটু বিশ্রাম নাও, আমি এখনই ওদের প্রস্তুত করে তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। তুমি তখন খুব মজা করে খেতে পারবে'। শিয়াল মনে মনে ভাবল আরে এ তো খুব ভালো কথা। মুরগি যে এত তাড়াতাড়ি রাজি হয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি সে। তাই খুশি মনে কুটিরের ভেতর গিয়ে বসে বসে বিশ্রাম করতে লাগত।

এদিকে সেখানে প্রতিবেশীর এক কুকুর টম এসে হাজির। সে আবার মুরগির খুব ভালো বন্ধু। বিশেষ করে ছানাদের সাথে তার খুব ভাব। টমকে পেয়ে তো মুরগি খুব খুশি হলো। টমকে কাছে ডেকে মুরগি সব খুলে বলল। টম বলল, দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা। টম কুটিরের সামনে গিয়ে 'ঘেউ ঘেউ' করতে লাগল। হঠাৎ কুকুরের ডাক শুনতে পেয়ে একেবারে হকচকিয়ে গেল বোকা শিয়াল। মজা করে মুরগির ছানা খেতে এসে তো দেখি এখন প্রাণটা যায়। আচমকা কুটির থেকে বের হয়েই বোকা শিয়াল দিল দৌড়। টমও শিয়ালের পেছনে দৌড়ে চলল। বোকা শিয়ালও দৌড়ায় টমও দৌড়ায়। হঠাৎ শিয়ালের খুব কাছে চলে এল টম। সুযোগ পেয়ে বোকা শিয়ালের লেজে দিল সজোরে এক কামড়। কামড় খেয়ে বোকা শিয়াল দিল জোরে এক চিৎকার। বনের সব শিয়াল সেই চিৎকার শুনে ফেলল। এদিকে বোকা শিয়াল জঙ্গলের ভেতর ঢুকে পড়ল। টম সেখান থেকে ফিরে এল। মুরগি আর তার ছানারা টমকে অনেক ধন্যবাদ দিল। এভাবে বুদ্ধি করে সে তার ছানাদের রক্ষা করতে পারল। এদিকে বোকা শিয়াল আর কখনো কোনো লোকালয়ের ঢোকার সাহস পায়নি। কারণ লোকালয়ে ঢুকলেই তার সেই টমের কথা মনে পড়ে যায়। টমের কামড়ের দাগ এখনও তার লেজে স্পষ্ট। জঙ্গলের অন্য শিয়ালরাও এ নিয়ে অনেক হাসাহাসি করে। অন্য শিয়ালরা মাঝে মধ্যেই বলে 'আরে বোকা শিয়াল, তুই এখনও বোকাই রইলি'।

সমুদ্রের প্রাণী ডুগং

অনিক শুভ

সমুদ্রের গভীরে এমন অনেক রহস্যময় প্রাণী আছে, যাদের ব্যাপারে আমরা অনেকেই কিছু জানি না। এরকমই একটি জীব হলো ডুগং। এটি আসলে একটি জলজ স্তন্যপায়ী প্রাণী, মালয় ভাষায় যার নামের অর্থ হলো 'সমুদ্রের ভদ্রমহিলা'। জলের প্রাণী হলেও ডুগং-এর সঙ্গে কিন্তু চরিত্রগত ভাবে হাতির মিল আছে। অস্ট্রেলিয়ার উত্তরে সমুদ্রের জলে এদের সাধারণত দেখতে পাওয়া যায়। তৃণভোজী ডুগং-এর কোনো পাখনা নেই, চলাফেরার জন্য ছোটো ছোটো পায়ের মতো অঙ্গ ব্যবহার করে। আর আছে ডলফিনের মতো লেজ। ভোঁতামুখো ডুগং-এর মুখ জলজ ঘাস খাওয়ার জন্য উপযুক্ত। প্রায় সত্তর বছর পর্যন্ত বাঁচতে পারে এরা। আকারে তিন মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়, গড় ওজন সাধারণত ৪০০ কেজির কাছাকাছি হয়ে থাকে। খুব লাজুক এই জীবরা একা-একা থাকতেই ভালোবাসে। এরা Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora র Appendix – I এবং Convention on Migratory Species র Appendix –II এর অন্তর্ভুক্ত।

প্রাপ্তবয়স্ক ডুগং ২.৫-৩.৫ মি. লম্বা এবং ওজন হয় ২৩০-৪২০ কেজি। এরা সাধারণত ৭০ বছর পর্যন্ত বাঁচে। একটু উষ্ণ জলে এরা বাস করে। প্রায় ৩৭ টি দেশের জলভাগে ডুগং বাস করে। সবথেকে বেশি ডুগং থাকে অস্ট্রেলিয়ার সমুদ্রে, মান্নার উপসাগর এবং ভারত ও শ্রীলঙ্কার মধ্যে অবস্থিত পক প্রণালীতে।

বর্তমানে এদের সংখ্যা কমে যাচ্ছে, যার প্রধান কারণ হলো এদের বাসস্থান নষ্ট হওয়া। ভারত মহাসাগর, আন্দামান ও নিকোবর, শ্রীলঙ্কার উপকূল ইত্যাদি অঞ্চলে অত্যধিক মাছ ধরাও এদের পক্ষে ক্ষতিকর হচ্ছে। ডুগং-রা স্তন্যপায়ী জীব। বাচ্চা ডুগং-রা প্রায় এক বছর ধরে মায়ের দুধ খায়। অথচ ডুগং-দের বাচ্চা হয় প্রতি সাত বছর অন্তর অন্তর। যে কারণে এক একটি বাচ্চা অনেক মূল্যবান!

এককালে তাদের মাংস আর তেলের জন্য শিকারিরা নির্বিচারে এই শান্তিপ্রিয় জন্তুদের হত্যা করত। এখনও মাছ ধরার সময় দুর্ঘটনার কারণে অনেক ডুগং মারা যায়। তবে এই মুহূর্তে তাদের সংরক্ষণের জন্য সারা বিশ্ব জুড়েই নানা প্রয়াস চলছে।

আনোয়ারা বেগম

বন্ধুরা, দীর্ঘ দশ বছর পর আবার তোমাদের সামনে বুদ্ধির খেলা নিয়ে হাজির হলাম। বুদ্ধির খেলা যদি তোমাদের ভালো লাগে আর এর দ্বারা তোমরা যদি উপকৃত হও তাহলে আশা করি এখন থেকে তোমাদের সাথে থাকতে পারব।

তোমরা যারা অনেক ছোটো, সবে স্কুলে যাও, কষ্ট করে পড়তে পারো তারা তো ফুটবল না খেললেও বল নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করো। আর বড়োরা তো ফুটবল খেলে, বল তোমাদের সবার প্রিয় খেলার সামগ্রী, তাই আজকে আমরা যেই খেলাটি খেলব, সেটি বল নিয়েই খেলব।

টিপু ও দিপু দুই ভাই। তারা মাসে ২/১ বার বন্ধুদের নিয়ে বুদ্ধির খেলার আসরে বসে। সেই আসরে টিপু ও দিপু তাদের বন্ধুদের নিয়ে দুই দলে থাকে। দীপু গণিতে খুব ভালো, সে খেলার মধ্যে কীভাবে গণিত প্রয়োগ করা যায় সেই নিয়ে চিন্তা করতে থাকে। যখনই তার মাথায় কোনো বুদ্ধি চলে আসে তখনই সে বুদ্ধির খেলার আসরের আয়োজন করে। আজ তার মাথায় একটি বুদ্ধি এসেছে। আর সেটা খেলার জন্যই এ আসরের আয়োজন।

সবাই বুদ্ধির খেলার আসরে উপস্থিত। দিপু টিপুকে বলল ভাইয়া আজকে আমরা বল নিয়ে খেলব। তাই এই ৩০টি ছোটো ছোটো সাদা বল এনেছি। আর আমাদের দেশের পতাকার রং সবুজের মধ্যে লাল বৃত্ত তাই লাল ও সবুজ রং এর পেন্সিল এনেছি। এগুলো সব তোমার দলকে দিয়ে দিলাম। এবার আমি যা বলব, তুমি তাই করো।

দীপু বলতে থাকল এই ৩০টি বলের মধ্যে তুমি কয়েকটি বল সবুজ রং দিয়ে সবুজ করো। কয়েকটি বল লাল রং দিয়ে লাল করে ফেল। কিছু বল লাল ও সবুজ উভয় রং দিয়ে রং করো। আর কিছু বল সাদাই থাকবে। তাড়াতাড়ি করে ফেল। ভাইয়া তুমি ইচ্ছা করলে তোমার দলের দুই-এক জনের সাহায্য নিতে পারো রং করার কাজ করতে। বাকিদের তোমাদের সংখ্যার কথা জানানোর দরকার নাই। তোমরা যারা রং করবে তারাই শুধু জানবে সংখ্যাটি।

কিছুক্ষণের মধ্যেই টিপু বলল, আমার রং করা শেষ। এবার বলো আমার কী করতে হবে? দিপু বলল ভাইয়া তুমি এবার বলো কয়টি বলে লাল রং, কয়টি বলে সবুজ রং এবং কয়টি বলে উভয় রং আছে। টিপু বলল, আমি যদি সবই বলে দেই তাহলে তুমি বুদ্ধি খাটাবে কোথায়? দিপু বলল, ভাইয়া তুমি কয়টি বল রং করো নাই তা আমি বলে দিব। টিপুর দলের অপু বলল, এটা তো একেবারে সোজা, রঙিন বলগুলো সব যোগ করে ৩০ থেকে বিয়োগ দিলেই তো সাদা রঙের বলের সংখ্যা বের হয়ে যাবে। দীপু বলল, ভাইয়া তুমি কিন্তু আমাকে কয়টি বলে রং করেছ বলবে না। তুমি বলবে কয়টি বলে সবুজ, কয়টি বলে লাল এবং কয়টি বলে সবুজ ও লাল উভয় রং আছে। আমি কিন্তু তোমাকে বলিনি কয়টি বলে শুধু সবুজ বা শুধু লাল রং আছে। আমি বলেছি লাল বা সবুজ রং আছে। টিপু বলল, ঠিক আছে বলছি। টিপু বলল, ২০টি বলে সবুজ রং, ১৫টি বলে লাল রং এবং ১০টি বলে লাল ও সবুজ রং আছে।

প্রশ্ন: দিপু বলল এবার আমার প্রশ্ন হলো কয়টি বল সাদা? তোমরা কি কেউ পারবে কয়টি বল সাদা আছে বলতে? অপু ভাইয়া তুমি তো বলেছিলে একবারে সোজা তুমিই বলো কয়টি বল সাদা।

উত্তর: অপু বলল, আমি তো ভেবেছিলাম একেবারে সোজা, রং করা বলগুলো যোগ করে মোট বল থেকে বিয়োগ করলে সাদা বলের সংখ্যা বের হয় যাবে।

কিন্তু না এখন তো দেখা যাচ্ছে রঙিন বলগুলো যোগ করলে দাঁড়ায় ২০+১৫+১০+=৪৫টি। বল তো আছে ত্রিশটি। তাহলে কীভাবে হবে?

বুদ্ধিঃ দিপু বলল এখানেই বুদ্ধি। বুদ্ধিটা হলো, বলা হয়েছে ২০টি বলের মধ্যে সবুজ রং আছে। এই ২০টি বলের মধ্যে উভয় রং এর ১০টি বলও আছে। কারণ উভয় রং এর বলের মধ্যে সবুজ রংও আছে। তাহলে শুধু সবুজ রং এর বল হলো (২০-১০)=১০টি। ১৫টি বলের মধ্যে লাল রং আছে। এই ১৫টি বলের মধ্যে উভয় রং এর ১০টি বলেও লাল রং আছে। তাহলে শুধু লাল রং আছে (১৫-১০) = ৫টি। তাহলে মোট রঙিন বল হলো সবুজ বল ১০টি+লাল বল ৫টি+উভয় রং এর বল ১০টি = মোট ২৫টি বল রঙিন। সুতরাং সাদা বল (৩০-২৫) = ৫টি।

এই তো গেল বুদ্ধির খেলা। এই রকম বুদ্ধি দিয়ে কিন্তু তোমাদের কোনো কোনো ক্লাসে অঙ্কও আছে। এমনকি বিসিএস প্রিলিমিনারি টেস্টেও এমন অঙ্ক থাকতে পারে। অঙ্ক হিসাবে থাকলে প্রশ্নটা নিম্নলিখিতভাবে হতে পারে-

একটি ঝুড়িতে ৩০টি বল আছে। এর মধ্যে ২০টি বলে সবুজ রং, ১৫টি বলে লাল রং এবং ১০টি বলে উভয় রং আছে। বাকি বলগুলো সাদা। তাহলে সাদা রং এর কয়টি বল আছে?

দুই. দিপুদের বাসার সামনে মাঠে ৪/৫ জন শিশু সুন্দর একটি বল নিয়ে খেলা করছে। দিপু বারান্দায় বসে শিশুদের খেলা উপভোগ করছিল। হঠাৎ দিপু দেখতে পেল খেলার এক ফাঁকে কীভাবে বলটি একটি বিল্ডিং এর দেয়ালের সাথে আটকানো পাইপে পড়ে গেছে। পাইপটি ছিল চার ফুট উঁচু, ফাঁপা, শূন্য এবং পাইপের নিচের প্রান্ত ছিল বন্ধ। ফলে যেই শিশুটির বল, সে বলের জন্য কান্নাকাটি শুরু করল। বন্ধুরা তার কান্না থামানোর জন্য অনেক চেষ্টা করল কিন্তু কিছুতেই সে কান্না থামাচ্ছে না। একজন পাইপে হাত ঢুকিয়ে বলটি তোলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু পাইপে হাত ঢুকাতে পারেনি। একজন বড়ো লাঠি নিয়ে আসল। কিন্তু এমন মসৃণ পাইপ থেকে কী লাঠি দিয়ে বল তোলা যায়? শিশুটির কান্না আরো বেড়ে যেতে লাগল। বন্ধুরা কোনো উপায় পাচ্ছিল না। দিপু শিশুটির কান্নার দৃশ্য দেখে আর থাকতে পারল না। সে মাঠে গেল এবং চিন্তা করতে লাগল কীভাবে বলটা বের করা যায়। চিন্তা করতে করতে পেয়ে গেল একটা বুদ্ধি। বুদ্ধি দিয়ে পাইপ থেকে বলটি বের করে দিল, শিশুটি বল পেয়ে খুব খুশি। দিপুকে ধন্যবাদ দিয়ে সে চলে গেল। এবার তোমরা বলো দিপু কী বুদ্ধি দিয়ে বলটি পাইপ থেকে বের করেছিল? পাইপটি দেয়ালের সাথে আটকে ছিল। পাইপটি উপুর করে বল বের করার কোনো উপায় ছিল না। আর তোমাদের সুবিধার জন্য বলছি মাঠে একটি পানির টেপ আর একটি পানির মগ ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তোমরা তাড়াতাড়ি বলে ফেল দিপু কী বুদ্ধি প্রয়োগ করে বলটি তুলে এনেছিল? পারবে না? ঠিক আছে, আমিই বলে দিচ্ছি বুদ্ধিটা।

বুদ্ধিঃ দিপু গতকাল বিজ্ঞান ক্লাসে শিখেছে কোনো বস্তুর ওজন যদি বস্তুর দ্বারা অপসারিত পানির ওজনের চেয়ে কম হয়, তাহলে বস্তুটি পানিতে ভেসে থাকবে। দিপু চিন্তা করল বলটির ওজন অবশ্যই অপসারিত পানির ওজনের চেয়ে কম হবে এবং পাইপে পানি দিলে বলটি পানিতে ভেসে উঠবে। তাই দিপু মগ দিয়ে টেপ থেকে পানি নিয়ে পাইপে ঢালতে থাকল। যেহেতু পাইপটি নিচের দিকে বন্ধ ছিল, সেহেতু পানি ঢালাতে পাইপটি পানিতে পূর্ণ হতে থাকল এবং বলটি পানিতে ভেসে উঠল। পানি ঢালতে ঢালতে এক পর্যায়ে পাইপটি প্রায় পূর্ণ হয়ে গেল। ফলে বলটি পাইপের খোলা প্রান্তে চলে আসলো। তখন দিপু বলটি পাইপ থেকে বের করে শিশুটির হাতে দিল। বল পেয়ে শিশুটি মহা খুশি।

আজকে 'দিয়া'র একক বক্তৃতা

সালেহ আহমাদ

উপজেলা নির্বাহী অফিসারের অফিসে জেলা প্রশাসক চিঠি পাঠিয়েছেন। চিঠি পড়ে বেশ চিন্তিত ইউএনও জনাব শরফুদ্দিন আহমেদ। কদিন আগেই ভালুকায় যোগদান করেছেন। বলতে হবে জনপ্রিয়তা পেয়েছেন বেশ দ্রুতই। পিঠা উৎসব, খেলাধুলার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনসহ অন্যান্য আরো কিছু কারণে তিনি এখন সবার প্রিয়পাত্র। তার আশেপাশে বসা বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাদের একজন উপজেলা সমাজসেবা কর্মকর্তা জনাব ইমাম হোসেন বললেন, সিরিয়াস ধরনের কোনো অফিস আদেশ স্যার! ইউএনও সাহেব সমাজসেবা কর্মকর্তাকে চিঠিখানা ধরিয়ে দিলেন। ইমাম হোসেন সিরিয়াস একটা ভাব নিয়ে ডিসি সাহেবের চিঠিখানা পড়তে শুরু করলেন। পড়াশেষে ইউএনও সাহেবের দিকে তাকালেন। তার ইশারায় ডান পাশে বসা শিক্ষা কর্মকর্তা মিসেস মিনা ইয়াসমিনের হাতে দিলেন। এভাবে উপস্থিত সবাই চিঠিটা অতি আগ্রহ নিয়ে পড়ল। সবাইকে দেখে মনে হলো তারা যতটা আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়ল, তাদের চোখেমুখে ততটা সিরিয়াস ভাব দৃশ্যমান হলো না। সবাই যেন অনেকটা নির্ভার। কাকতালীয় ভাবে সবাই কোরেশের মতো করে বলল, স্যার এত চিন্তার কী -আমাদের 'দিয়া' আছে না !

আমাদের দিয়া আছে ঠিকই কিন্তু সমস্যা তো ঐ দিয়াকে নিয়েই। ঢাকা, ময়মনসিংহের বেশ ক'টা স্কুলের টিচার উঠেপড়ে লেগেছে দিয়াকে তাদের স্কুলে ভর্তি করাতে। ভিকারুননেসার এক টিচার বলে গেছেন, প্রয়োজনে দিয়ার আব্বাকে তারা ঢাকায় বদলি করিয়ে নিবে। কিছুদিন পর দিয়ার বড়ো বোনও ঐ কলেজে ভর্তি হবার চেষ্টা করবে। এমন অবস্থায় বিনা চেষ্টায় ঢাকা বদলি হতে পারলে মন্দ কী। এসব ব্যাপারে দিয়ার মন ভালো নেই। কদিন থেকেই লক্ষ্য করছি দিয়া আমার বাসায় আসছে না। আমার ড্যানী'র (বানর) জন্য কলা আনছে না। তাছাড়া ডিসি স্যার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মান যাচাইয়ের কথা বলেছেন। দিয়া তো প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করল। ইউএনও সাহেব থামলেন।

স্যার দিয়া প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করেছে ঠিক, কিন্তু নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়নি। এ হিসেবে দিয়ার সমস্যা হওয়ার কথা নয়, শিক্ষা অফিসার বললেন।

সমাজসেবা কর্মকর্তা বললেন, যদি অনুমতি দেন তাহলে একটা কথা বলি-

-অনুমতির প্রয়োজন নেই বলে ফেলুন।

-স্যার দিয়া আনডাউটলি ট্যালেন্টেড। কিন্তু উপস্থিত বক্তৃতা হলো চর্চার বিষয়, অনুশীলনের বিষয়।

এ বিষয়ে দিয়া'র অনুশীলন না থাকলে বিষয়টি পুর্নবিবেচনাযোগ্য। উপজেলায় আরো অনেকেই আছে তাদের দিয়ে চেষ্টা করা যেতে পারে।

আপনার কথায় যুক্তি আছে। তবে ময়মনসিংহ শহরের সাথে প্রতিযোগিতা করতে হলে দিয়ার বিকল্প নেই। দিয়ার সাথে আমার যে কদিন কথা হয়েছে, তাতে আমার মনে হয়েছে দিয়ার স্বাভাবিক কথা বলার ধরনই শ্রেষ্ঠ বক্তৃতা। আর একটা বিষয় হলো, দ্বিতীয় হওয়া দিয়ার মানসিকতার সাথে মানানসই নয়। সে ক্ষেত্রে দিয়াকে রাজি করানোই সমস্যা। রাজি হয়ে গেলে বাকিটা দিয়াই দেখবে। তাছাড়া আমি যতটুকু জেনেছি তাতে মূলব্যক্তি মনে হয়েছে দিয়ার আম্মাকে। উচ্চশিক্ষিতা ভদ্রমহিলা বাচ্চাদের নিয়ে খুব ভাবেন। শুধু বাচ্চাদের কারণেই কোনো চাকরির চেষ্টা করেন নি। তার বিদ্যাবুদ্ধির সবটাই খরচ করছেন সন্তানদের পেছনে। দিয়ার আম্মু রাজি হলেই, ব্যাস- দিয়ার ভূমিকা এখানে গৌণ। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা নিমাই চন্দ্র সাহা বললেন, আমি আপনার সাথে একমত। দিয়া পরীক্ষিত। বিকল্প চিন্তা করার প্রয়োজন নেই।

ঠিক আছে এ দায়িত্বটা আমরা শিক্ষা অফিসারকে দিলাম। মিনা আপনার প্রধান কাজ দিয়ার আম্মার সাথে কথা বলা। আজ থেকেই আপনার মিশন শুরু। ওকে, সবাইকে ধন্যবাদ। প্রয়োজনে আবার আমরা বসব। সবাই একত্রে বসেই সিদ্ধান্ত নেব। ইউএনও শরফুদ্দিন আহমেদ অঘোষিত সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

বিকেলের মধ্যেই চাওর হয়ে গেল, ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিতব্য উপস্থিত বক্তৃতায় ভালুকার প্রতিনিধিত্ব করবে দিয়া। বেশ কিছুদিন পর গোলপুকুর বৈঠকে সবাই হাজির। শুধু দিয়া নেই। সবার দৃষ্টি দিয়ার বাসার দিকে। রিনি বলল, দিয়া আসছে না এতে দিয়াকে দোষ দেওয়া যাবে না। আমরা তো সবাই ভর্তি পরীক্ষার জন্য কোচিং নিয়ে ব্যস্ত। দেখেছি বেচারি কদিন একাই পুকুর ঘাটে এসে বসে থেকে চলে গেছে। তাই হয়ত আজ আসছে না। চলো আমরা দিয়াকে নিয়ে আসি। নোভা, রিনির কথার সাথে সুর মিলিয়ে বলল, রিনি ঠিকই বলেছে। চলো আমরা দিয়াকে নিয়ে আসি। লোরা বলল, আমারও একমত। দিয়াকে ছাড়া কি গোলপুকুর বৈঠক জমে? সবাই উঠল। দরজায় নক করতেই দিয়ার আম্মা দরজা খুলে দিল। নওশিন বলল, আন্টি দিয়া কই?

-দিয়া ওর রুমেই আছে। তোমরা ভেতরে যাও। ভেতরে ঢুকে সবাই চমকে গেল। দিয়ার পড়ার টেবিলে একগাদা বড়ো বড়ো মনীষীর জীবনীগ্রন্থ। সে সব গ্রন্থের একটিতে মগ্ন দিয়া। অনেকগুলো পায়ের শব্দে সে পেছনে তাকালো। বলল, কী ব্যাপার, তোমরা এ অসময়ে। আজ তোমাদের কোচিং নেই?

রিনি বলল, তুমি শোনোনি? তুমি ময়মনসিংহ যাচ্ছ উপস্থিত বক্তৃতায় অংশ নিতে?

-শুনেছি। বাবা বলেছে। আচ্ছা তোমরাই বলো তো উপস্থিত বক্তৃতার কিছু বুঝি আমি? কোনোদিন উপস্থিত বক্তৃতায় আমাকে দেখেছ? দেখনি। আমার চেয়ে তোমরা সবাই উপস্থিত বক্তৃতায় ভালো। ইমতি ছেলেটা তো সবার চেয়ে ভালো। তোমাদের কাউকে সিলেক্ট না করে কেন আমাকে সিলেক্ট করল আমার মাথায় ধরে না। আমি নিশ্চিত এগারো উপজেলার মধ্যে আমার স্থান হবে এগারোতম। তাতে ভালুকার মানসম্মান থাকবে ?

-কী যে বলো তুমি! তোমার তো বক্তৃতার ধরনের প্রয়োজন নেই। যেভাবে কথা বলো সেভাবে বললেই চলবে। নওশিন বলল।

-তোমরা তো আমাকে ভালোবাসো তাই এমন করে বললে। তোমরা যদি বিচারক থাকতে তাহলে কথা ছিল। টিভিতে উপস্থিত বক্তৃতায় দেখো না। উপস্থিত বক্তৃতার ঢং-ই আলাদা। ঐ ঢং রপ্ত করতেই তো অনেকটা সময় লেগে যাবে। তাছাড়া উপজেলার ইংরেজি আদ্যক্ষরের ক্রমিক নং অনুযায়ী উপস্থিত বক্তৃতার জন্য প্রতিযোগীদের মঞ্চে ডাকা হবে। 'ভি' এর ক্রমিক একবারে শেষে। সব ভালো ভালো বিষয়গুলো আগেই শেষ হয়ে যাবে। তখন আমার অবস্থা কী হবে ভেবে দেখেছ ? লোরা বলল, দিয়া এজন্যই তো তোমাকে সিলেক্ট করা। নয়ত আমাকে কিংবা রিনিকে, নয়ত ইমতিকেই সিলেক্ট করা হতো।

-তোমরা একটু বসো। আমি আসছি। আম্মু ডাকছে। দিয়া ভেতরে চলে গেল।

রিনি বলল, বলো তো দিয়া কোথায় গেল? নোভা বলল, আমাদের জন্য নাস্তা আনতে। ওদের তো কাজের মানুষ নেই। আন্টি নিজ হাতেই সব কাজ করে। দিয়াও আন্টিকে প্রচুর হেল্প করে। লোরা বলল, আন্টি পারেও !

দিয়া এখন ময়মনসিংহ যাচ্ছে। বিকেলে ঐতিহাসিক অশ্বিনী কুমার হলে আন্তঃউপজেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় উপস্থিত বিতর্ক প্রতিযোগিতা। ইউএনও সাহেব নিজ গাড়ি করে নিয়ে যাবে। দিয়ার বাবা-মা সাথে যাবে। ওদের শুভকামনা জানাতে কলোনির সবাই উপস্থিত হয়েছে। দিয়া কারো সাথে কোনো কথা বলছে না। দিয়ার এই স্বভাবে প্রথম প্রথম সবাই বিরক্ত হতো। এখন হয় না। সবাই জেনে গেছে কিছু করার আগে দিয়া ঐ বিষয়ের প্রতি নিমগ্ন থাকে। বলা যায় বিষয়ের প্রতি ডুবে থাকে। সবাই দিয়াকে নানারকম উপদেশ দিচ্ছে। দিয়া চুপচাপ শুনে যাচ্ছে শুধু।

ময়মনসিংহ শহরের ঐতিহ্যবাহী অশ্বিনী কুমার হল। লোকে লোকারণ্য। ইউএনও শরফুদ্দিন আহমেদের চোখ কপালে উঠেছে। বাচ্চাদের বিতর্ক অনুষ্ঠানে এত মানুষের উপস্থিতি সে কখনো দেখেনি। দিয়ার বাবাকে বললেন, আমি বিস্মিত, আমি অভিভূত। বাচ্চাদের অনুষ্ঠানে এত লোকের সমাগম ! এটা আমার প্রথম দেখা। মাসুদ সাহেব, এ জন্যই কী ময়মনসিংহকে বলা হয় শিক্ষার শহর? দিয়ার বাবা কোনো জবাব দিলেন না। শুধু মুচকি হাসলেন।

বিতর্ক শুরু করতে দর্শকরা কোলাহল শুরু করে দিয়েছে। ডিসি সাহেব এখনো আসেনি। তার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে-বিচারকমণ্ডলী, প্রতিযোগী সবাই। বেশ কিছুক্ষণ পর ডিসি সাহেব এলেন। তিনি আসার পরই ভালুকার ইউএনও সাহেবকে ডেকে জানালেন, তিনি দিয়ার সাথে কথা বলতে চান। আরো বললেন যে মেয়েটা প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় ময়মনসিংহের মুখ উজ্জ্বল করেছে, তার সাথে আগেই কথা বলা উচিত ছিল। তা তিনি পারেননি। দিয়াকে সরি বলতে হবে। জবাবে শরফুদ্দিন আহমেদ বললেন, স্যার উপস্থিত বক্তৃতার আগে তা করা উচিত হবে না। দিয়া ভালো রেজাল্ট করলে এ বিষয়টি বিতর্কিত হওয়া অস্বাভাবিক নয়। ডিসি সাহেব বললেন, এমন করে তো ভাবিনি। চিন্তায় ফেলে দিলে আহমেদ। তাহলে তো আমাকে পুরোটা সময় থাকতে হবে। ডিসিদের কী এতটা সময় থাকে ?

আপনিই সিদ্ধান্ত নিন স্যার, কী করবেন। তবে স্যার অনুষ্ঠানের আগে দিয়ার সাথে কথা বলা ঠিক হবে না।

-তুমি যথার্থই বলেছ। শুধু দিয়ার জন্যই আমাকে থাকতে হচ্ছে।

-দিয়া তো শেষ প্রতিযোগী। ওর বক্তব্য শুনুন স্যার। আপনার ভালো লাগবে।

ঘোষক উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা শুরুর ঘোষণা দিলেন। ঘোষক অনুষ্ঠান উদ্‌বোধন করার জন্য জেলা প্রশাসক জনাব রিয়াজুল ইসলামকে অনুরোধ করলেন। জেলা প্রশাসক মহোদয় ছোটো একটি বক্তৃতা দিয়ে উপস্থিত বক্তৃতার অনুষ্ঠানের উদ্‌বোধন করলেন। শুরু হলো বাচ্চাদের মনকাড়া বক্তৃতামালা।

একজন প্রতিযোগীর বক্তৃতা শেষে হল ভর্তি দর্শক হাত তালি দিয়ে আনন্দঘন পরিবেশের সৃষ্টি করতে থাকল।

ভালুকার ইউএনও সাহেব লক্ষ্য করলেন, প্রত্যেক উপজেলা থেকেই দর্শক এসেছে। ময়মনসিংহে বসবাসকারী বিভিন্ন উপজেলার মানুষও এসেছে। হাততালির অবস্থা দেখে তার এমনি মনে হলো। তিনি কিছুটা চিন্তিত হলেন। দর্শকের হাততালির একটা ইতিবাচক দিক আছে। কিছুটা সুবিধা আছে। দিয়া হয়ত সেই সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবে। আবার ভাবলেন, দিয়ার কোনো কিছুরই প্রয়োজন হবে না। দিয়াতো দিয়াই। দিয়ার বিকল্প কোথায়!

একে একে দশ উপজেলার প্রতিযোগী তাদের উপস্থিত বক্তৃতা শেষ করল। ঘোষক মঞ্চে এসে সর্বশেষ প্রতিযোগী হিসেবে 'দিয়া'র নাম ঘোষণা করলেন। সেই সাথে বললেন, এ বছর প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষায় বাংলাদেশে দ্বিতীয় হওয়া দিয়া। দিয়া ময়মনসিংহের গর্ব। সাথে সাথেই অডিটোরিয়াম যেন উল্লাসে ফেটে পড়ল। এমন উল্লাসে চমকে গেলেন ইউএনও সরফুদ্দিন। তিনি তাকালেন ডিসি সাহেবের দিকে। ডিসি সাহেব দেখলেন আহমেদ সাহেবকে। তিনি বললেন, এটা তো নিশ্চিত বিস্ময়ের ব্যাপার। দিয়া তো রীতিমতো ক্রেজ। উভয়েরই দৃষ্টি পড়ল দিয়ার দিকে। দিয়ার ড্রেস দেখে আর একবার চমকে উঠলেন ডিসি রিয়াজুল ইসলাম। এর আগের বক্তারা দামি দামি আধুনিক ডিজাইনের ড্রেস পড়ে মঞ্চে এসেছে। দিয়ার পরনে সাধারণ সুতির পোশাক। দিয়া মাইক্রোফোনের সামনে এসে টেবিল থেকে বক্তব্যের বিষয় সম্বলিত কাগজটি হাতে তুলল। হল ভর্তি মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ দিয়ার দিকে। সবার চোখেমুখে একই প্রশ্ন-দিয়ার বক্তব্যের বিষয় কী? কাগজের ভাঁজ খুলে দেখল। এতে দিয়ার মুখের আকৃতির কোনো পরিবর্তন হলো না। গুটিগুটি পায়ে দিয়া মাইক্রোফোনের সামনে এসে

দাঁড়াল। মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়াতেই সুনসান নীরবতা নেমে এল অশ্বিনী কুমার হলে। দিয়া বক্তব্য শুরু করল। অনুষ্ঠানের শ্রদ্ধেয় সভাপতি, বিদ্যাময়ী সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা। প্রধান অতিথি জনাব জেলা প্রশাসক, সম্মানিত বিচারকমণ্ডলী এবং ঐতিহাসিক অশ্বিনী কুমার হলে উপস্থিত সুধীজন, গুণীজন, আপনারা সবাই আমার সশ্রদ্ধ সালাম গ্রহণ করুন।

আপনারা সবাই যদি ভেবে থাকেন, বক্তৃতা দিয়ে আমি আপনাদের মন-প্রাণ ভরিয়ে দেব। আমি বলব তাহলে আপনারা ভুল করছেন। কারণ আমি কখনো কোনো অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখিনি। আজই প্রথম। বক্তৃতা বিষয়টিও আমার পছন্দনীয় নয়। আমি কাজে বিশ্বাসী। তা ছাড়া আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি আমার আগে যারা এখানে বক্তব্য রেখেছেন, তারা আমার চেয়ে অনেক বেশি জানে এবং তাদের বলার ধরন আমার চেয়ে অনেক বেশি উদ্দীপক, তথ্যবহুল। আমার মা-বাবা সামনে বসে আছেন। তাদের আমি বলেছিলাম, ইউএনও আংকেলের কথায় তোমাদের রাজি হওয়া ঠিক হয়নি। আমি কখনো বক্তব্য দেইনি। কিভাবে বক্তব্য দিতে হয় আমি জানি না। জবাবে বাবা-মা বললেন, তুমি পারবে। আমার আত্মবিশ্বাসের নাম বাবা-মা। সেই আত্মবিশ্বাসেই আমি আপনাদের সামনে দাঁড়িয়েছি।

আমাকে বলতে হবে, কোচিং সেন্টার নিয়ে। এ বিষয়ে কথা বলা আমার জন্য খুব কঠিন। কারণ কোচিং সেন্টারের সাথে আমার পরিবারের কোনো সম্পর্ক নেই। আমার বড়ো বোন এবার এসএসসি দেবে। সে কখনো শ্রেণিতে দ্বিতীয় হয়নি। কোচিং সেন্টারের আঙিনায় পা না রাখার পরও প্রাথমিক এবং মাধ্যমিকে ট্যালেন্টপুলে স্কলারশীপ পেয়েছে। আমার মেজো বোন ঢাকায় একটি ইংরেজি স্কুলে পড়ে। সেখানকার পড়ার ধরন এমন যে কাউকে কোচিংমুখী হতে হয় না। আমার পড়ালেখার বিষয়টা দেখাশুনা করে আমার বাবা-মা। আপনারা এবার বলুন কোচিং সেন্টার নিয়ে কিছু বলা আমার জন্য সহজ কোনো বিষয় কিনা?

কোচিং সেন্টারের সাথে আমার কোনো সম্পর্ক না থাকলেও আমার অনেক সহপাঠী কোচিং সেন্টারে পড়ালেখা করে। মাঝে মাঝে তাদের ওপর আমার খুব রাগ হয়। তারা কোচিং সেন্টারে পড়ে, রাগ সে জন্য নয়। বিকালবেলায় খেলার মাঠে তাদের পাওয়া যায় না। শীতের বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলা হয় না, গোলপুকুর বৈঠক জমে না-রাগ সে কারণে। আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে, গোলপুকুর বৈঠক

কী ? আমাদের কমপ্লেক্সে একটা পুকুর আছে। ঐ পুকুরের কোনো কোণ নেই। আমি তার নাম দিয়েছি 'গোলপুকুর বৈঠক।' সপ্তাহে মাত্র একদিন বিকেলে পুকুর ঘাটে আমরা বসে গল্প করি। অবশিষ্ট ছয়দিন আমাকে একা একাই হাঁটাহাঁটি করতে হয়। বন্ধুদের কাউকে পাই না। আমি বুঝতে পারি, তারা সময় করে ওঠতে পারে না। স্কুলের পড়া রেডি করতে হয়। আবার কোচিং-এর পড়াও। বিকেলে খেলাধুলার সময় কোথায় তাদের! এতে শারীরিকভাবে তারা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে এমনও আমার মনে হয়। শরীর গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই, গুণীজনেরা এ কথাই বলে আসছেন। আমার বাবা-মাও একথা বলেন।

আমার কিন্তু সময়ের অভাব হয় না। মা আমাকে রুটিন করে দিয়েছে। সে রুটিন মতো আমাকে মায়ের কাছে নাচ শিখতে হয়, গান শিখতে হয়। আমার মামা এসে আমাকে ছবি আঁকা শেখায়। সকালে খবরের কাগজ এলে ছোটোদের পাতা বাবা আমাকে পড়তে বলত। এখন আমিই বাবার কাছ থেকে ছোটোদের পাতা নিয়ে নেই।

যে পাঠ্যবই স্কুলে পড়ানো হয়, কোচিং সেন্টারে সে বই পড়ার প্রয়োজন আছে তা আমার পরিবার মনে করে না। পাঠ্যবইয়ের বাইরে অনেক বই, পত্রিকা বাবা আমাকে এনে দেয়। সেগুলো আমি আগ্রহ নিয়েই পড়ি। এগুলো পড়ার সময় মাঝে মাঝেই মনে হয়, পৃথিবীটা আমার সামনে চলে আসে। অ্যান্টার্কটিকা পর্যন্ত কী হচ্ছে জানা যায়। প্রতিদিনের বিশ্ব মগজে আশ্রয় নেয়। তাতে নতুন নতুন ভাবনা এসে মনের দ্বারকে অবারিত করে। আমার চারপাশে অন্যরকম সব আলোতে ভরে যায়। সে আলোতে মনের আঁধার কেটে যায়। আঁধার জীবনকে এগুতে দেয় না-আমার জন্য এটা প্রযোজ্য নয়।

কোচিং সেন্টারগুলো আমাদের সময় কেড়ে নেয়। আর সময় কেড়ে নেওয়ার অর্থই আঁধারের প্রাচীর পেরোতে না দেওয়া। কিন্তু আমাদের লক্ষ্য, উদ্দেশ্যই তো আঁধার দূর করা। এ বিষয়গুলো বিবেচনায় কোচিং সেন্টারের ভূমিকা সবটাই প্রশ্নবোধক হয়ে সামনে দাঁড়ায়। তাতে অনেকেই বলেন কোচিং সেন্টারের প্রয়োজন নেই। আমার বাবা-মাও তাই মনে করে। সে কারণে কোচিং সেন্টারে আমার কখনো যাওয়া হয়নি। কোচিং সেন্টারের কোনো ভালো দিক আছে কিনা তা আমি বলতে পারছি না। আপনারা আমাকে মাফ করবেন।

ঘণ্টা বাজল। যার অর্থ আমাকে অর্ধ মিনিটের মধ্যে বক্তব্য শেষ করতে হবে। বলার মতো কিছুই আমি বলতে পারিনি। কিছু ব্যক্তিগত কথা বলতেই সময় শেষ হয়ে গেল। আসলে সময় তো কারো জন্য অপেক্ষা করে না। পৃথিবীতে যারা বড়ো হয়েছেন, তারা সময়কে শতভাগ কাজে লাগিয়েছেন। আমাদের জেলা প্রশাসক সাহেব এখানে উপস্থিত আছেন। তিনি ইচ্ছে করলেও সময়ের অপব্যবহার করতে পারবেন না। নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় সময়টাকে তিনি সিঁড়ির একেকটি ধাপ হিসেবে দেখেছেন। ধাপের পর ধাপ তিনি পেরিয়েছেন। আমার বিশ্বাস তিনি কোচিং সেন্টারের থমকে দেওয়া সময়ের শিকার হননি।

আপনাদের সবাইকে আমি আবার সালাম জানাচ্ছি। আল্লাহ্ আপনাদের মঙ্গল করুন। আল্লাহ হাফেজ।

দিয়া মঞ্চ থেকে নেমে তার আসনে বসল। বেশ কিছুটা সময় থমকে থাকার পর করতালিতে 'অশ্বিনী কুমার হল' মুখরিত হলো। এতক্ষণ দর্শকরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে দিয়ার কথা শুনছিল।

অনুষ্ঠানের সভাপতি মাইক্রোফোন হাতে নিলেন। বিভিন্ন বিষয়ে তিনি কথা বলতে থাকলেন। বিচারকগণ প্রভাবিত হতে পারেন, এ জন্য তিনি কারো নাম উল্লেখ করলেন না। দিয়ার বিষয়টি তিনি বললেন, বক্তৃতার ঢঙে না গিয়েও বক্তৃতা করা যায়, আমরা তা উপভোগ করলাম। আমার কাছে রেজাল্ট শিট চলে এসেছে। রেজাল্ট শিট বলছে সবাই খুব ভালো বলেছে। সবার নম্বর খুব কাছাকাছি। তবে যে প্রথম হয়েছে, তার নম্বরের সাথে অন্যদের নম্বরের বেশ পার্থক্য দেখা যাচ্ছে। আমি তৃতীয় থেকে নাম ঘোষণা করব। তাতে কে প্রথম হলো তা জানার জন্য আপনাদের আগ্রহ অম্লান থাকবে। তৃতীয় হয়েছে নান্দাইলের প্রতিযোগী ফারহান ইসলাম। তার প্রাপ্ত নম্বর বাহাত্তর। দ্বিতীয় হয়েছে সদর উপজেলার সাজিদুল কবির। সাজিদুলের প্রাপ্ত নম্বর আটাত্তর। প্রথম হয়েছে একটি মেয়ে। তার প্রাপ্ত নম্বর-আটানব্বই। মেয়েটির নাম ঘোষণা করার আগে আমি আপনাদের সবাইকে বিচারক মানছি। আপনারা এখানে ময়মনসিংহের সব উপজেলার দর্শক রয়েছেন। বিচারক সব সময় নিরপেক্ষ। নিজেদের বিচারক বিবেচনায় বলুন, আপনার বিচারে কে প্রথম হতো ? এক মুহূর্ত না ভেবে সবাই একযোগে বলল, দিয়া, দিয়া, দিয়া।

অপরূপ লোভাছড়া

রুমান হাফিজ

বিদেশের কোনো স্থান নয়, এটি সিলেটের লোভাছড়া। নীলাকাশে সাদা বকের উড়াউড়ি। ঢেউয়ের দোলায় ছন্দময় দুলুনি। চোখ জুড়ানো সবুজের আস্ফালন। চারদিক থেকে ধেয়ে আসা বিশুদ্ধ হাওয়া। সিলেটের কানাইঘাট উপজেলার লক্ষ্মীপ্রসাদ ইউনিয়নে অবস্থিত এক মনোহারিণী স্থান লোভাছড়া। মূলত লোভাছড়া চা বাগান-ই নাম এটির। আর এই চা বাগানের সূত্র ধরেই পুরো একটা বিশাল এলাকার নাম হয়েছে লোভাছড়া। দেখলে মনে হবে বিদেশের কোনো স্থানেই ভ্রমণে বেরিয়েছেন। কিন্তু না, সৌন্দর্যের এই লীলাভূমি সিলেটের লোভাছড়ায়। যেখানে মিশে আছে পাহাড়, মেঘ আর আকাশ। নদীর স্রোতে ইঞ্জিনহীন ডিঙি নৌকায় ভেসে চলা কিংবা পাথর নিয়ে গন্তব্যে ছুটে চলা বিশালাকারের স্টিমার, সেই সঙ্গে স্টিমারকে ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলা শ্রমিকদের জীবনচিত্র-সবকিছু দেখে মুগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোনো পথই থাকে না। বড়ো বড়ো স্টিমারের ছুটে চলার পথ বেয়ে নদীজলের আস্ফালন, বিশাল সব ঢেউ বুকে অদ্ভুত শিহরণ বইয়ে দেয়।

সিলেট থেকে বাসে বা সিএনজিতে কানাইঘাট পৌঁছে সেখান থেকে সুরমা নদীর বুক চিরে নৌকাযোগে যেতে হয় লোভাছড়ায়। আর নৌকায় ওঠার পর থেকেই শুরু হয় নাগরিক কোলাহলমুক্ত, বিষের বাতাসমুক্ত ও যান্ত্রিকতার দাবানল ছাড়া স্নিগ্ধ সুশোভিত এক নতুন পথচলা।

নৌকা চলার কয়েক মিনিট পরেই যে কেউ হারিয়ে যাবে নিজস্বতা থেকে। নৌকার ঝাঁকুনি, ঢেউয়ের সঙ্গে অবাক ছন্দে উপর-নিচ দোল খাওয়া, সীমাহীন আকাশের ক্ষণে ক্ষণে রূপ পালটানো রং, ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা বকের দলের হাওয়ার সঙ্গে উড়াউড়ি- এ সবকিছুই যে কাউকে নিজের অজান্তেই টেনে নিয়ে যাবে ভাবনার অন্য এক জগতে।

নদীপাড়ের মানুষের জীবনচিত্র দেখতে দেখতে আপনি কখন পৌঁছে যাবেন কাঙ্ক্ষিত লোভাছড়ায়, সেটা টেরই পাবেন না। ভাবছেন, এত চমৎকার সব দৃশ্য অবলোকনের পর লোভাছড়ার আর কিইবা দেখব কিন্তু দেখার অনেক কিছুই আছে!

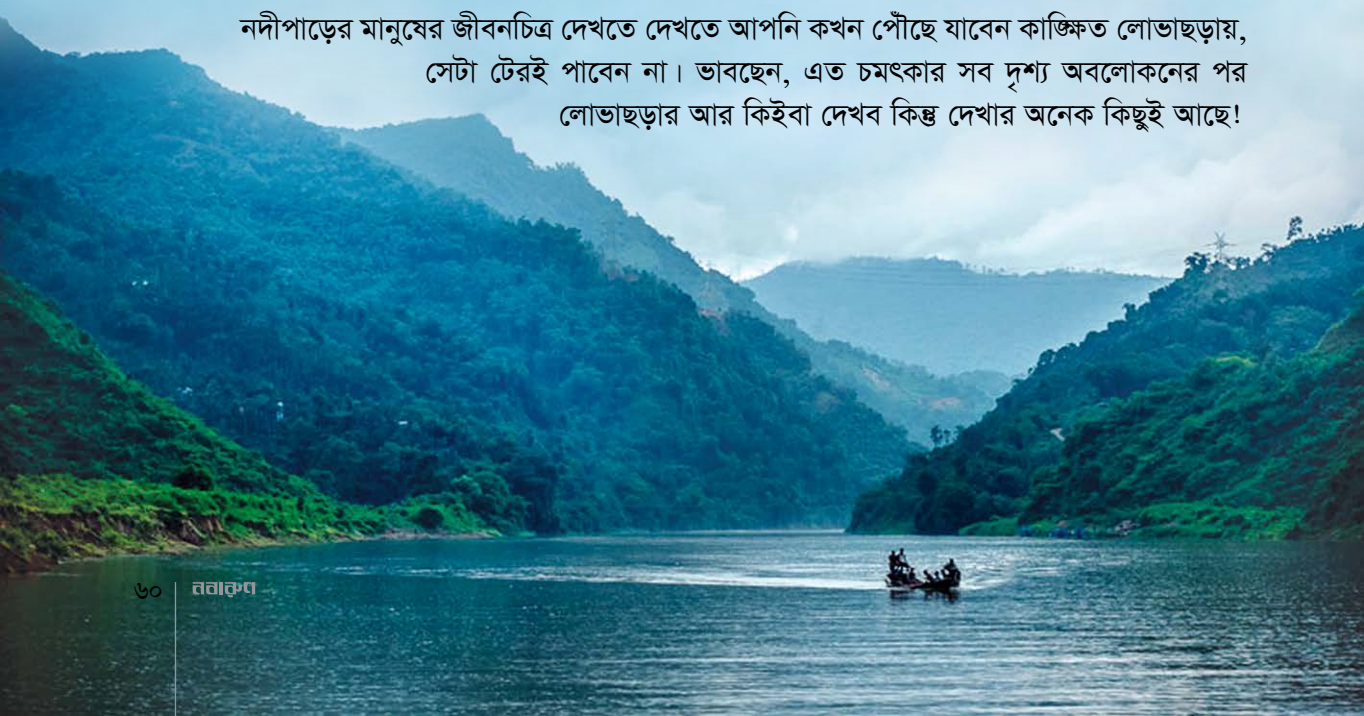

লোভাছড়ার যেখানে গিয়ে আপনার নৌকা থামবে, সে জায়গাতেই নদীর পাথুরে পাড় দেখে আপনি বিস্ময়ে মুগ্ধ হবেন। পাশেই চারদিকে বিশালাকারের ডালপালা নিয়ে স্বগর্বে দণ্ডায়মান বটবৃক্ষকে ঘিরে চা শ্রমিকদের চা-পাতা নিয়ে কাজকর্ম দেখতে গিয়ে আপনি নিশ্চিত থমকে যাবেন। এরপর দু-তিন মিনিট হাঁটলেই হারিয়ে যাবেন সবুজ নিসর্গের মধ্যে।

হাঁটতে হাঁটতেই চোখে পড়বে লোভাছড়ার বাসিন্দাদের অদ্ভুত নির্মাণশৈলীর ছোটো ছোটো কুটির। কুটির থেকেই চেয়ে থাকা ছোট্ট শিশু-কিশোরদের মায়াবী চাহনি দেখে আপনার মনে হবে এমন চাহনি কতদিন যে দেখিনি!

চারপাশের মনমাতানো সবুজের শ্যামলিমায় মুগ্ধ হয়ে আপনি হাঁটছেন ক্লান্তিহীনভাবে। হঠাৎ করেই থমকে যাবেন, এ কি!

রাঙামাটিতে চলে এলাম নাকি! আপনার এই বিস্ময়ের কারণ, রাঙামাটির মতোই একটি ঝুলন্ত ব্রিজ রয়েছে এই লোভাছড়ায়! আপনি আরো বিস্মিত হবেন, যখন দেখবেন ব্রিজটির গায়ে খোদাই করে লেখা রয়েছে ব্রিজটি নির্মিত হয় ১৯২৫ সালের এপ্রিল মাসে।

এই ঝুলন্ত ব্রিজ আপনাকে ঘোরের মধ্যে ফেলবে, সেই আমলে এই বনভূমিতে কোন্ যানবাহন চলত? কারা বসবাস করত এখানে? এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে আপনাকে ইতিহাসের আশ্রয় নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

যেভাবে যাবেন

দেশের যে-কোনো জায়গা থেকেই সিলেট এসে বাসে করে যাওয়া যাবে কানাইঘাট, ভাড়া ৬০ টাকা অথবা সিলেট থেকে সিএনজি রিজার্ভ করেও যাওয়া যাবে। এ ক্ষেত্রে ভাড়া নেবে ৬০০ টাকার মতো। কানাইঘাট থেকে নৌকায় লোভাছড়ায় যেতে জনপ্রতি ভাড়া নেবে ৩০-৪০ টাকা। চাইলে রিজার্ভ নৌকাও নিতে পারেন।

শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমেছে

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রবণতা আগের তুলনায় অনেক কমেছে। সরকারিভাবে বাল্যবিবাহ নিয়ে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করায় এটি সম্ভব হয়েছে। সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপ, যেমন- নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধি করা, নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা এবং বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ কমেছে। ১২ই মার্চ সচিবালয়ে বাংলাদেশের বাল্যবিবাহ পরিস্থিতি বিষয়ক এক প্রেস কনফারেন্সে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী মেহের আফরোজ চুমকি এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, কোনো সমীক্ষার মাধ্যমেই প্রমাণ কারা যাবে না বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের সংখ্যা বেড়েছে। এ সময় তিনি বিভিন্ন জরিপ চিত্র তুলে ধরেন-

- বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফি হেলথ সার্ভে অনুযায়ী ২০০৪ সালে বাল্যবিবাহের সংখ্যা ছিল ৬৮.৪ শতাংশ। ২০১৪ সালে সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৮.৬ শতাংশে।
- বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিক্স (বিবিএস) এবং ইউনিসেফের যৌথ সম্পাদিত মাল্টিপল ক্লাস্টার সার্ভে অনুযায়ী ২০০৫ সালে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের সংখ্যা ছিল ৬৪.১ শতাংশ। ২০১৩ সালে তা কমে হয়েছে ৫২.৩ শতাংশ।
- ২০১৭ সালে বিআইডিএস সম্পাদিত এক জরিপে দেখা যায়- বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের সংখ্যা ৪৭ শতাংশ এবং ১৫ বছর বয়সের নিচে সম্পাদিত বিয়ের সংখ্যা ১০.৭ শতাংশ।

এই জরিপ তথ্যগুলো উপস্থাপন করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমেছে।

সংবাদ সম্মেলনে ইউনিসেফ-এর বাংলাদেশের রিপ্রেজেনটেটিভ অ্যাডওয়ার্ড বিজবার্ডার বলেন, ইউনিসেফ-এর কোনো ডকুমেন্টেই বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রবণতা বেড়েছে এ কথা বলা হয়নি বরং সকল তথ্য উপাত্তের মাধ্যমে বুঝা যায় বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের প্রবণতা কমেছে।

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

বিশেষ শিশুর নিরাপত্তা

আবিদের বয়স আট বছর। সে একজন বিশেষ শিশু (অটিজম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ)। তার মা-বাবা দুজনেই চাকরি করেন। সকালে আবিদকে স্কুলে দিয়ে তারা অফিসে চলে যান। দুপুরে একজন গৃহকর্মী ওকে বাসায় নিয়ে আসেন। বিকেলের মধ্যেই মা-বাবা ঘরে ফিরে এসে আবিদকে সময় দেন। চলছিল ভালোই কিছুদিন ধরে আবিদের বড়ো ভাই খেয়াল করল, আবিদ দারুণ খিটখিটে হয়ে উঠেছে, আগের চেয়ে অনেক বেশি রাগ করছে, কখনো নিজেকে আঘাত করছে, কখনো অন্যদের আঘাত করছে, এমনকি মা-বাবাকেও আঘাত করার চেষ্টা করছে।

আবিদের বড়ো ভাই তমাল। সে তার বাবা-মাকে বিষয়টি জানালো। বাবা-মা আবিদকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলেন। ডাক্তার সময় নিয়ে আবিদকে পরীক্ষা করে তার গায়ে বেশ কিছু শারীরিক আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেলেন। পরে গৃহকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেল, আবিদ দুপুরে স্কুল থেকে ফিরে বিরক্ত করত বলেই গৃহকর্মী মাঝে মধ্যে তাকে লাঠি দিয়ে আঘাত করত। সেখান থেকেই আবিদের আচরণের পরিবর্তন।

অটিজমসহ অন্যান্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সার্বিক সচেতনতা তৈরি করতে হবে। অনেক সময় সামাজিক পরিবেশে এ ধরনের শিশুদের ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করা হয়; দোকানে, শপিংমলে বা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের উত্যক্ত করা হয়। এমনকি স্কুলে বা পরিবারের মধ্যেও এদের কেউ কেউ বিদ্রুপের শিকার হয়ে থাকে, যা এক ধরনের মানসিক নির্যাতন। আবার অনেক সময় তাদের আচরণের কারণে বিরক্ত হয়ে পরিবারের সদস্য, শিক্ষক বা পরিচর্যাকারীরা তাদের শারীরিকভাবে আঘাত করেন।

চিকিৎসকের মতে বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশুদের নিরাপত্তায় করণীয় :

১. শিশুর সক্ষমতা অনুযায়ী তাকে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, বিশেষ করে স্পর্শকাতর অঙ্গগুলোর নাম শেখাতে হবে

২. 'স্ট্রেনজার ইজ ডেনজার'-এটি সবসময় মাথায় রেখে অপরিচিত বা নতুন কারো কাছে (তিনি পুরুষ হন বা নারী) শিশুকে নিরাপদ মনে করা চলবে না

৩. শিশুকে মা-বাবা তার শরীরের বিভিন্ন অংশে স্পর্শ করে 'ঠিক' বা 'ঠিক নয়' বা 'গুড টাচ', 'ব্যাড টাচ' বিষয়গুলো শেখানোর চেষ্টা করতে হবে

৪. শিশুর আচরণের পরিবর্তনগুলো মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করুন। শিশু হঠাৎ রেগে গেলে, কান্নাকাটি করলে, বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ হবার পর আবার শুরু হলে, ঘুমের মধ্যে চিৎকার করে উঠলে, মা-বাবাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাইলে, শিশুর হাঁটা-চলার সমস্যা হলে, শরীরে আঁচড়, কামড়ের দাগ দেখা দিলে, বিশেষ কাউকে দেখে ভয় পেলে, মনমরাা হয়ে থাকলে বা অন্য কোনো আচরণের হঠাৎ পরিবর্তন হলে সতর্ক হোন। নিপীড়নের বিষয়টি মাথায় রেখে অনুষ্ঠান করুন

৫. সামাজিক দক্ষতা শেখাতে হবে। এ জন্য 'বেসিক লাইফ স্কিল' প্রশিক্ষণ প্রয়োজন হতে পারে। যেসব শিশুর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ নেওয়ার মতো সক্ষমতা নেই, তাদের জন্য বাবা-মা বিশেষ ব্যবস্থা নেবেন। তাদের কখনোই একা রাখবেন না। বিশেষ করে কোনো সেবা বা পরিচর্যা নিতে গেলেও সব সময় সন্তানের সঙ্গে থাকবেন, কারো কথায় প্রভাবিত হয়ে সন্তানকে একা ছাড়বেন না।

অটিজম বা অন্যান্য বিশেষ শিশুকে তার ব্যক্তিগত কাজগুলো শেখাতে হবে, যাতে গোসল করা, টয়লেটে যাওয়া বা নিজের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে অপরের সাহায্য যাতে না লাগে। ভাষার ব্যবহার বা ইশারা ভাষা শেখানোর সময় মনে রাখতে হবে যে, তারা যেন কোনো ধরনের নির্যাতনের বিষয়টি মৌখিক বা ইশারায় বুঝাতে সক্ষম হয়।

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

মো. শাহিদী হাসিব, কেজি শ্রেণি, রেডিয়েন্ট প্রিক্যাডেট উচ্চ বিদ্যালয়

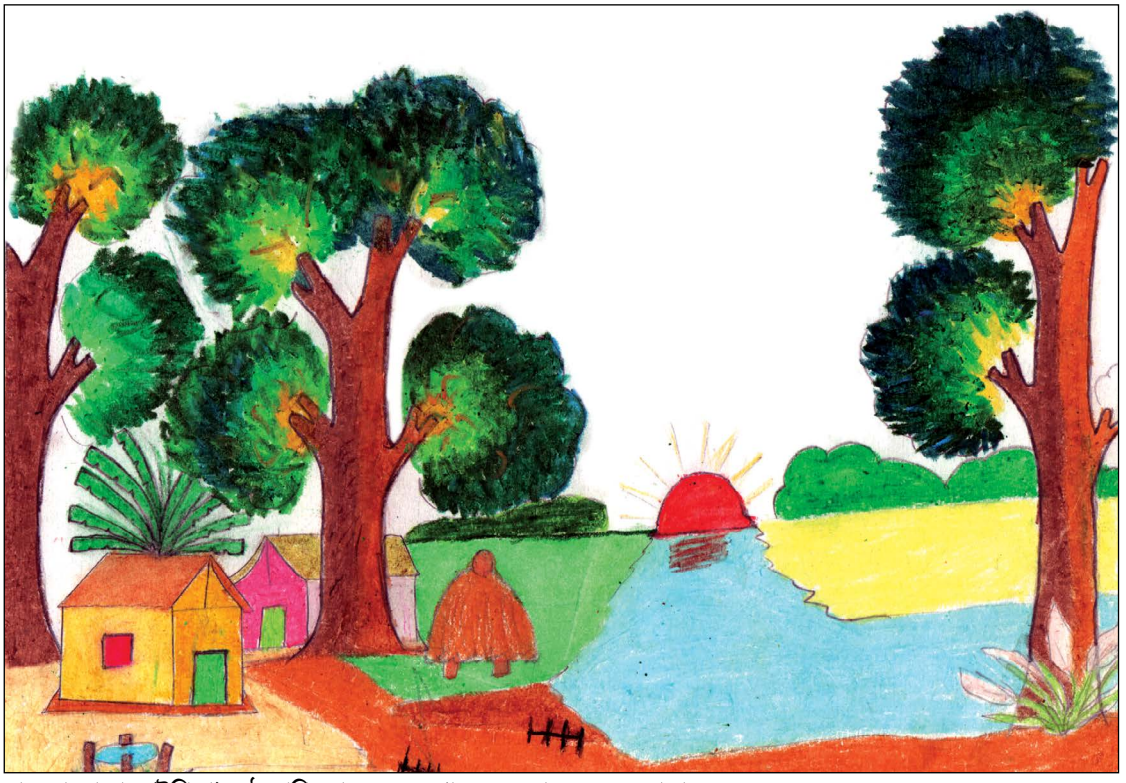

হাজেরা আক্তার (ঈশিতা) ষষ্ঠ শ্রেণি, সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

অতনু দাস, চতুর্থ শ্রেণি, নব কিশলয় প্রি-ক্যাডেট নার্সারি স্কুল

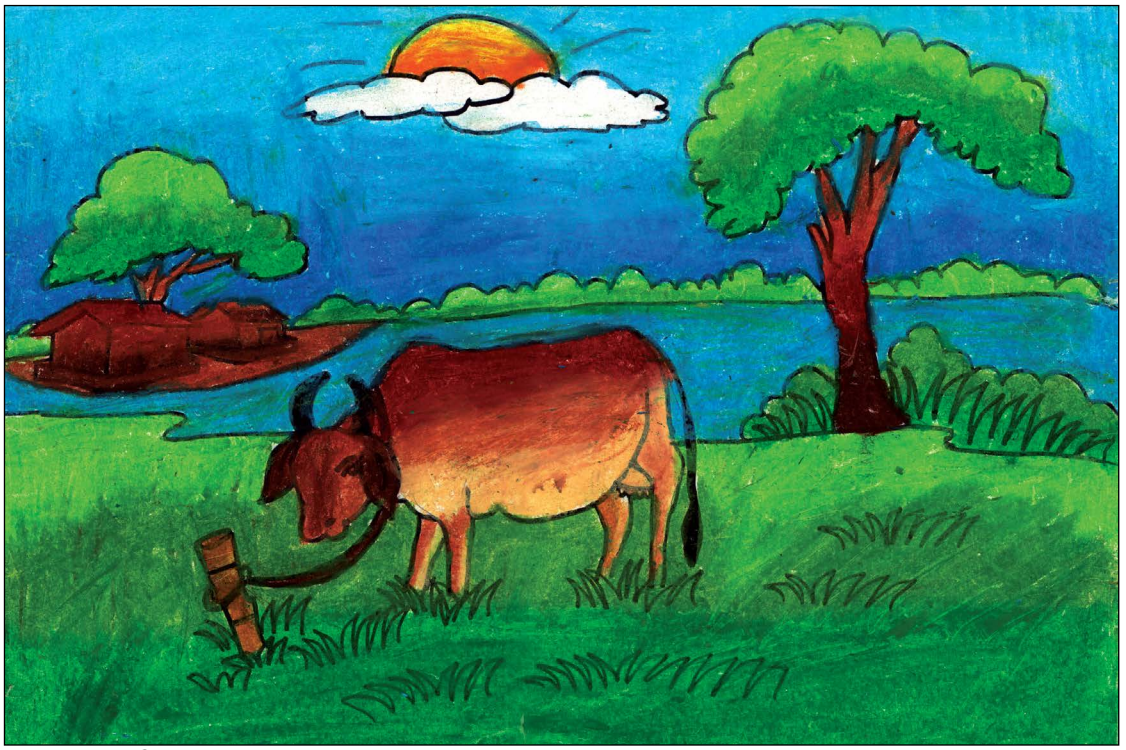

আদিল হক, তৃতীয় শ্রেণি, রিলায়েন্স একাডেমি, ঢাকা

শেখ হাসিনার ১০টি বিশেষ উদ্যোগ

উদ্যোগ ৯

বিনিয়োগ বিকাশ

শেখ হাসিনার নির্দেশ
বিনিয়োগ বান্ধব বাংলাদেশ

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা তো জানো সম্প্রতি বিশ্ব মানচিত্রে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে ক্ষুধামুক্ত মধ্যম আয়ের বাংলাদেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে যাচ্ছে বর্তমান সরকার।

তোমরা আরো জানো, বাংলাদেশ এক বিপুল সম্ভাবনার দেশ। এই সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কিছু যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে 'বিনিয়োগ বিকাশ'। এর স্লোগান হচ্ছে, 'শেখ হাসিনার নির্দেশ/বিনিয়োগ বান্ধব বাংলাদেশ'। বিনিয়োগ বিকাশের লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছে। দেশের ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ইপিজেড-এ ২০১৬ সালের জানুয়ারি থেকে মার্চ, তিন মাসে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ৩৮৮৮.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। বিনিয়োগ খাতে প্রবৃদ্ধি ১৪০.৫৮ মিলিয়ন ডলার। ২০১১ সালের প্রথমবারের মতো বিদেশি বিনিয়োগ ছিল ১০০ কোটি মার্কিন ডলার। ২০১৫ সালে ২০০ কোটি মার্কিন ডলার এবং ২০১৭ সালে তা ৩০০ কোটি মার্কিন ডলার ছাড়িয়ে যায়। এছাড়া বিনিয়োগকারীদের জন্য সরকার কর অবকাশসহ বিভিন্ন প্রণোদনার সুযোগ সৃষ্টি করেছে এবং ইতোমধ্যে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আর এই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা হচ্ছে–অধিকতর প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে রূপকল্প ২০২১-এর আওতায় বৈদেশিক বিনিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা ৫.৪ বিলিয়ন ডলার নির্ধারণ করা হয়েছে।

প্রতিবেদন : সুলতানা বেগম

Regd, Dha, 143-Monthly Nabarun, Vol-42, No- 11, May 2018, Tk-20.00

মেয়ের জন্য রাজ্য

সাত বছরের ছোট্ট মেয়ে এমিলির রাজাদের নিয়ে অনেক আগ্রহ। খেলার ছলে একদিন বাবাকে বলল, কোনো দিন কি রাজকন্যা হতে পারব, বাবা? বাবার মনে কথাটি দাগ কাটল। শুরু হলো মেয়ের জন্য রাজ্য খোঁজা। বাবা জেমিরিয়াহ হিটেন ইন্টারনেট খুঁজে বের করলেন ৮০০ বর্গ মাইল আয়তনের বির টাওয়িল নামের জায়গা। মিসর ও সুদানের মধ্যবর্তী অনুর্বর পার্বত্য এ এলাকাটির কোনো মালিকানা নেই। বাবা বুদ্ধি করে যোগাযোগ করলেন মিশরীয় কর্তৃপক্ষের কাছে। মিশর সরকার বির টাওয়িল যাওয়ার অনুমতি দিল। যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ার বাসিন্দা হিটেন ১৪ ঘণ্টা যাত্রা করে বির টাওয়িল পৌঁছেই হিটেন সাম্রাজ্যের পতাকা পুঁতে দিলেন। গাঢ় নীল পতাকার নিচের দিকে তিনটি সাদা তারা আর ওপরে একটি তারা। মাঝে হিটেন পরিবারের সীলমোহর। বাড়ি ফিরে বাবা হিটেন একটি মুকুট বানালেন আর পড়িয়ে দিলেন রাজকন্যা এমিলির মাথায়। বদলে ফেললেন রাজকন্যার রুমের সজ্জা। সবকিছুতেই আনলেন রাজকীয় ভাব। পরিবারের সবাই মিলে পরামর্শ করে রাজ্যের নাম রাখলেন 'দ্যা কিংডম অব নর্থ সুদান'।

খনি ব্যবসায়ী হিটেনের রাজ্য জয়ের কাহিনি ২০১৩-২০১৪ সালে সবার মনে সাড়া দিয়েছিল। পরবর্তীতে এ নিয়ে গল্প শোনা না গেলেও বাবা তার মেয়ের জন্য রাজ্য গড়েছেন, এ তো রূপকথার গল্পের মতোই।

রাজ্য হোক বা না হোক সব বাবার মনের রাজ্যে মেয়েরা রাজকন্যা হয়েই থাকে।

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা